পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতার পরবর্তী নাটক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য

এই অধ্যায়ে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী নাটক, প্রবন্ধ, ছড়া, সঙ্কলন, ভ্রমণ সাহিত্য, চরিত সাহিত্য ইত্যাদি আলোচনা করব। প্রথমমেই ধরা যাক নাট্যাভিনয়ের কথা।

কাব্যগ্রন্থ বা কথা সাহিত্যর মত নাট্যচর্চা ও একটি শিল্প। ফলতঃ নিসন্দেহে তা সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিকের সুন্দরতম অভিব্যক্তি বলা চলে। বিশেষ করে নাটক পরিবেশনার দিক থেকে দৃশ্য-শ্রাব্য বলে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সাক্ষর পাঠক নয়, নিরক্ষর দর্শকের কাছেও তার আবেদন সুদূর প্রসারী। কোচবিহারের নাট্যজগতও এই নিয়মের বাইরে নয়। প্রাক্ স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্য ধারা যেন একই সূত্রে গাঁথা। স্বাধীনতা পরবর্তী কোচবিহারের নাট্য চর্চার আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে জানা প্রয়োজন যে এখানাকার নাট্য চর্চার ধারাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা সঙ্গত। একটি মৌলিক নাট্য রচনা, অপরটি নাট্যাভিনয় যা প্রথানুগ অথবা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রথমে পারফর্মিং আর্ট বা অভিনয় কলা বিচারে কোচবিহারের নাট্য জগতে যদি সুক্ষ্ম বিভাজন রেখা টানা যায় তবে দেখা যাবে কোচবিহারে বর্তমানে নাট্যাভিনয়ের পাঁচটি ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান। ধারাগুলি হল, লোকনাটক, গ্রুপ থিয়েটার, সৌখিন নাট্যাভিনয়, গণনাট্য ও যাত্রাভিনয়। এর মধ্যে লোকনাটক একই সঙ্গে নাটক এবং লোক সাহিত্যের অভিব্যক্তি বলে লোক সাহিত্যের অঙ্গনেই তার আলোচনা সঙ্গত বলে মনে হয়। তাই এই অধ্যায়ে বাকি চারটি ধারা ও এতদঞ্চলের বিভিন্ন নাট্যকারের রচিত মৌলিক নাটকের আলোচনা করে দেখা যাক কোচবিহারের নাট্য জগতের কোন চিত্র ফুটে উঠে।

ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে তাকালে দেখাযাবে অসম অঞ্চল থেকে আগত বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেব অঙ্কিয়া নাট বা এনাকিয়া নাট নামে এক নাট্য ধারার প্রবর্তন করেন। তাছাড়া তিনি নিজে কালিয় দমন, শ্রীরাম বিজয় নামে নাটক, পত্নিপ্রসাদ, কৃষ্ণ গুণমালা, কেলিগোপাল, রুক্মিণী হরণ, পারিজাত হরণ, সীতাস্বয়ম্বর, রাম বিজয় ইত্যাদি নাটক রচনা করেন। তবে এগুলি ভাষা ও প্রকরণ বিচারে অসমীয়া বলেই গণ্য।

তবে জয়নাথ মুন্সী তাঁর রাজোপাখ্যানে উল্লেখ করেছেন কোচবিহার রাজবাড়ীতে রঙ্গমন্দির ছিল যেখানে অভিনয় কলা প্রদর্শিত হত। তবে সম্পূর্ণ আধুনিক নাট্যকলার যে নির্ভর যোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় তা কোচবিহার ব্রিটিশের করদ মিত্র রাজ্য হবার পর থেকে।

১৮৭০ সালে খাগড়াবাড়ী অঞ্চলে সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশের উদ্যোগে তারই বাড়ির অঙ্গনে খাগড়াবাড়ী ড্রামাটিক্ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অভিনিত প্রথম নাটক হল 'রত্নাবলী'। পরে এই ক্লাব রাজদরবারে হরিশচন্দ্র নাটকটি প্রদর্শন করেন। ১৮৮৩ সালে মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে এই ক্লাবই নাট্যাভিনয় করে। ১৮৮৪ সালে পন্ডিত সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ রচিত ' দৌপদী পরিণয়' এই ক্লাব মঞ্চস্থ করে। ১৯২৮ সালে হরমোহন রায়ের মাতৃ স্মৃতিতে তারই প্রদত্ত জমির উপর করুণাময়ী হল গড়ে ড্রামাটিক্ ক্লাব একটি প্রতিষ্ঠিত নাট্য মঞ্চ লাভ করে। কিন্তু ১৯৪৩ এ করুণাময়ী হল লুপ্ত হলে ড্রামাটিক ক্লাব আবার অস্থায়ী মঞ্চে নাটক করা শুরু করেন। পরবর্তী কালে এই ক্লাবের নাম পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় খাগড়াবাড়ী ক্লাব এবং ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এরা কোচবিহারের ধর্ম মন্দিরের অস্থায়ী নাট্য মঞ্চে নাটক করতেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাগড়াবাড়ী ক্লাবের স্থায়ী নাট্য মঞ্চ গঠনের প্রয়াস ক্রমশঃ সার্থক রূপ পরিগ্রহ করে। কোচবিহার জেলার প্রথানুগ নাট্যাভিনয়ে এই সংস্থাটির ভূমিকা বলা বাহুল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে পন্ডিত সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আর যাদের ভূমিকা এই সংস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে কোচবিহারের নাট্য জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে

তারা হলেন রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত, মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ, খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা ও উত্তর বঙ্গের গিরীশ চন্দ্র বলে গণ্য প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য। এ ছাড়া যে সব ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের সৌখিন নাট্য জগৎ ও গ্রুপ থিয়েটার অদ্যাবধি আবর্তিত হয়ে চলেছে তাঁদের নাম ও যে সংস্থাগুলির সাথে তাঁরা যুক্ত ছিলেন বা আছেন সেই সংস্থাগুলির পরিচয় নীচে দেওয়া হল :-

নাট্য ব্যক্তিত্ব	সংস্থার নাম
১। এস. ঘোষ, ডেপুটি কমিশনার, কোচবিহার।	ইয়ংমেন্স থিয়োট্রিকাল ক্লাব
২। চিন্তা হরণ রায়	প্রাগুক্ত
৩। কুমার কনক নারায়ণ	প্রাগুক্ত
৪। অশ্রুমান দাশগুপ্ত	কোচবিহার মিউজিক্যাল ক্লাব
৫। হিমাদ্রী বল্লভ বিশ্বাস	প্রাগুক্ত
৬। ললিত মোহন বক্সি	প্রথমে কোচবিহার মিউজিক্যাল ক্লাব ও পরে উঃবঃ রাঃ পরিবহন রিক্রিয়েশন ক্লাব
৭। সত্যনারায়ণ সুকুল	নিজের নাট্যদল
৮। চারুচন্দ্র রায়	প্রথমে বাণীমন্দির ক্লাব পরে নবারুণ সংঘ
৯। অশ্বিনী সরকার	বাণীমন্দির ক্লাব
১০। রমণীকান্ত সাহা	প্রাগুক্ত
১১। রমেশ চন্দ্র রায়	খাগড়াবাড়ী নাট্যসংঘ (জমিদান)
১২। নিরজ বিশ্বাস	উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন রিক্রিয়েশান ক্লাব, কোচবিহার ও মেঘমল্লার
১৩। ষষ্ঠী ভৌমিক	প্রাগুক্ত
১৪। নিখিল ভট্টাচার্য	প্রাগুক্ত
১৫। নীলমনি হাজরা	প্রাগুক্ত
১৬। ভারতী গাঙ্গুলী	প্রাগুক্ত
১৭। স্বরাজ সোম	নবারুণ সংঘ
১৮। রনদাশঙ্কর ভট্টাচার্য	প্রাগুক্ত
১৯। সুনীল দাশগুপ্ত	প্রাগুক্ত
২০। ভবেশ অধিকারী	শক্তি সংঘ
২১। সুনীল সাহা	নবলিপি নাট্য সংস্থা
২২। কানন মজুমদার	রবীন্দ্রনগর সেবা সংঘ
২৩। পুলক দেবরায়	প্রাগুক্ত
২৪। আশুতোষ দত্ত	নক্ষত্র নাট্য গোষ্ঠী ও সংশপ্তক
২৫। দীপঙ্কর চক্রবর্তী	সময়ানুগ
২৬। দীপায়ন ভট্টাচার্য	ইন্দ্রায়ুধ
২৭। নিরুপম দত্ত	প্রাগুক্ত
২৮। প্রসুন বন্দোপাধ্যায়	বর্ণনা
২৯। ইন্দুভূষণ ভদ্র	সপ্তর্ষি
৩০। শংকর দত্তগুপ্ত	প্রতীক্ষা
৩১। দেবব্রত ভট্টাচার্য	ইঙ্গিত

মাথাভাঙ্গা

নাট্য ব্যক্তিত্ব	সংস্থার নাম
৩২। অধীর ধর	আশুতোষ ক্লাব
৩৩। আলোক ধর	প্রাগুক্ত

তুফানগঞ্জ

৩৪। নিখিল রায়	রানিং বুলেট্‌স
৩৫। অজিৎ চক্রবর্তী	প্রাগুক্ত

মেখলীগঞ্জ

৩৬। মিনতি পালচৌধুরী	প্রথমে মনমোহন নাট্য সমিতি পরে
৩৭। চিন্তাহরণ রায়	নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হল

উল্লিখিত নাট্য ব্যক্তিত্ব ও তাদের সংস্থাগুলির উল্লেখে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নাট্যজগতের ক্রম উন্নতির ধারার সংক্ষিপ্ত চিত্রস্পষ্ট হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য নাট্যজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব না হলেও বিধিবদ্ধ যে সংস্থাগুলি কোচবিহারের নাট্য জগৎকে আলোড়িত করেছে তাদের এলাকা ভিত্তিক পরিচয় এখানে ক্রমান্বয়ে দেওয়া হল - ২

নাট্য সংস্থার নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	অভিনিত নাটক
খাগড়াবাড়ী ড্রামাটিক ক্লাব (পরে খাগড়াবাড়ী ক্লাব)	১৮৭০	রত্নাবলী, হরিশচন্দ্র, দৌপদি পরিণয়, নির্বান, নরনারায়ন, সীতা, শ্রীবৎস, প্রফুল্ল, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, উপেক্ষিতা, দেবলাদেবী, ঈশাখাঁ, শারদোৎসব, পরীর ডানা, ঝাঁসীর রাণী, বিসর্জন অচলায়তন, ফুল, বিদ্রোহী, বিশুর বিয়ে, চোর, গোড়া, ডাইনোসেরাস, পরাণমন্ডলের ঘর গেরাস্থি, লাজ বিপনী, অপছায়া, রাজার বাড়ী কতদূর, উলঙ্গ রাজা, বোধন, সারি সারি মৃত দেহ, ধাক্কা।
ইয়ংমেন্স থিয়েট্রিকাল ক্লাব (প্রতিষ্ঠাতা কুমার কনকেন্দ্র নারায়ণ)		
কোচবিহার ড্রামাটিক ক্লাব (প্রতিষ্ঠাতা জেনকিন্স স্কুলের শিক্ষক তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, উৎসাহ দাতা জমিদার)	১৯০৭	রিজিয়া প্রতাপাদিত্য

সুরেশ চন্দ্র মুস্তাফি, পরে এটি ইয়ংম্যান্স থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের সাথে মিলে যায়		সংসার, আলিবাবা
মিউজিক্যাল ক্লাব (প্রানপুরুষ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অশ্রুমান দাশগুপ্ত, ললিত মোহন বক্সি, হিমাদ্রী বল্লভ বিশ্বাস)	১৯১৯	মোগলসন্ধ্যা
সত্যনারায়ণ সুকুলের গোষ্ঠী	----	চন্দ্রগুপ্ত
কোচবিহার ক্লাব (পরে এই ক্লাব পি.ভি.এন.এন. এর উদ্যোগে সত্যনারায়ণ সুকুলের নাট্যসংস্থা, Youngmen's Theatrical Club, Town Club মিশে যায়।	১৮৯৭	কর্ণার্জুন, কারাগার, কৃষ্ণসুদামা, মিশর কুমারী, ইরাণের রাণী, রীতিমত নাটক, চিরকুমার সভা, ব্যাপিকা বিদায়, মালা রায়, সিন্ধু গৌরব, রায়গড়, মানময়ী গার্লস স্কুল, খনা, ঝরাফুল।
বাণী মন্দির ক্লাব	১৯৩২	চাঁদ সদাগর, থামও রক্তপাত, পুরোহিত, জিজ্ঞাসা, পার্থসারথী, কর্ণ, বিজয়া, বৃত্রসুর, টিপু সুলতান, পারমিট, দ্বীপান্তর, সোনার সংসার, বাংলার মেয়ে , বিরাজ বৌ।
ছদ্মবেশী সম্প্রদায় (প্রথমে নাট্য দল হলেও পরে যাত্রা দলে রূপান্তরিত হয়। সংস্থার প্রাণ পুরুষ ছিলেন ধীরানন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য, শচীন মিশ্র।)	১৯৩৯	মায়ামৃগ, উল্কা, সারদামণি, এন্টনী কবিয়াল, বৌদির বিয়ে, দুই পুরুষ, আজকাল, পথিক, দীপশিখা, অকূল গাঙের মাঝি, যমালয়, হুলুস্থুল, মেঘমুক্ত, তাইতো, আলিবাবা।
হাজরাপাড়া ক্লাব (পরে হাজারাপাড়া তরুন দল)	১৯৪১	প্রতাপাদিত্য, দুই পুরুষ, নার্সি হোম, ঋনংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, কমলাকান্তের জবানবন্দী, সিরাজদৌল্লা, বঙ্গে বর্গী, দ্বীপান্তর, ষোড়শী, সত্য মারাগেছে, কেদার রায়, লালপাঞ্জা, মমতাময়ী হাসপাতাল, ম্যানিয়া, কাঞ্চনরঙ্গ, থামাও রক্তপাত, এরা ও মানুষ, এক পেয়ালা কফি, কুন্তি-কর্ণ-কৃষ্ণা, এবং নিরজ বিশ্বাস রচিত- চোরাবালি, একটি কুঁড়ির মৃত্যুতে

সাংস্কৃতিক সংঘ	১৯৪৬	ছেঁড়া তার, ডাকঘর, সীতা, রথের রশি, মুক্তির উপায়, কেদার রায়, রণজিৎ সিংহ, মীরকাশিম, সাজাহান, ঝুন ঝুনি, চিচিং ফাক, ডাউন ট্রেন, তিন বন্ধু, রত্নপীঠ, রক্তকরবী, কালের বিচার, কাবুলিওয়ালা, গোলপার্ক, মানময়ী গার্লস স্কুল, দেবলা দেবী, শিশুনাটক - চুয়া চন্দন, মাটির প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, রূপকথা কথা কয়।
পাটাকুড়া ক্লাব	১৯৪৮	রামের সুমতি, দুই পুরুষ, মহারাজা নন্দ কুমার, চাঁদ সদাগর, মা, বড় বৌ, রণজিৎ সিং,
মহারাজা শ্রী জীতেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব	১৯৪০	মন্ত্রশক্তি, চিরকুমার সভা, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, বিরিঞ্চি বাবা, শেষ রক্ষা।
নবারুণ সংঘ	১৯৪৮	সিরাজের স্বপ্ন, দেবলা দেবী, টিপু সুলতান, সীতারাম, সাজাহান, বঙ্গে বর্গী, রক্তের ডাক, পনমুক্তি, উষা হরণ, লক্ষণের শক্তিশেল, আনন্দমঠ, শতাব্দীর স্বপ্ন, বিসর্জন, মহাগুরু নিপাত, মৌ চোর, মাটির ঘর, লাল পাঞ্জা, মুচকি মঙ্গল কাব্য, রক্তে রোয়া ধান, অবশ্যম্ভাবী, জরাসন্ধের সিংহাসন।
রবীন্দ্রনগর সেবা সংঘ	১৯৪৯	চন্দ্রগুপ্ত, সিরাজদ্দৌলা, কেদার রায়, সোনার বাংলা, বিপ্লবী বাঙ্গালী, কালো মাটির কান্না, বুদবুদ, বৈকুন্ঠের উইল, পার্থসারথী, রক্তে রোয়া ধান, ক্রীতদাস, ছেঁড়া তমসুক, বাগদী পাড়া দিয়ে, সৈনিক ধরো হাতিয়ার, রক্ত তিলক, বৈশাখী।
যন্ত্রী সংঘ ও ইউনাইটেড জিমন্যাসিয়াম	৪০এর দশক	টিপু সুলতান, রামের সুমতি
বিদ্যাসাগর পাঠাগার	১৯৫২	ভ্রাতৃ মিলন, বঙ্গে বর্গী, কালা পাহাড়
নেতাজী সংঘ	১৯৫৩	

নাট্যশ্রী	১৯৫৩/৫৪	রাণী দুর্গাবতী, উল্কা, ক্ষুধা, অভিযান, মহারাজা নন্দ কুমার।
খাগড়াবাড়ী নাট্য সংঘ	১৯৫৪	মহরাজা নন্দ কুমার, মিশর কুমারী, বিচার, গৈরিক পতাকা, রামের সুমতি, বাস্তুভিটা, রক্ত করবী, মুক্ত ধারা, কালের যাত্রা, গোল টেবিল (মৈষালবন্ধু, সতী বেহুলা - স্থানীয় ভাষায়) কয়লা কাটে যারা, মহেশ, ভগীরথ, প্রিয়তমাষু, কালো মানুষ, উপায়, লাঠি, ভয়, ক্রীতদাস, কোলকাতার যিশু, মানসপুত্রী, রাজপাখীর গল্প, চিরন্তনী, সরমা, ছোট বকুঅ পুরের যাত্রী।
মহারাজা জীতেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব	১৯৪০(১৯৫৪ থেকে নাট্যচর্চা শুরু)	যন্ত্রশক্তি, চিরকুমার সভা, ঋণং কৃত্বাঘৃতং পিবেৎ, বিরিঞ্চিবাবা, শেষ রক্ষা, এবাড়ি ও বাড়ি, বাংলার মেয়ে, মাটির ঘর, গৃহপ্রবেশ।
ইউনাইটেড ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন	১৯৫৫-৫৬ থেকে নাট্যচর্চা	বিন্দুর ছেলে, এক পশলা বৃষ্টি, নিষ্কৃতি, মমতাময়ী হাসপাতাল।
স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব	১৯৫৮	রায়গড়, রণজিৎ সিংহ, প্রত্যাবর্তন, পার্থসারথী, কঙ্গাবতীর ঘাট, ফেরারী ফৌজ, আমি মন্ত্রী হব, নহবত, চোর, কেদার রায়, পদ্মিনী, মিশরকুমারী, ঘৃতং পিবেৎ, মেসনং ৪৯, ভাড়াটে চাই, ডম্বরু ডাক্তার, সংক্রান্তি, বৈকুন্ঠের খাতা, শতাব্দীর স্বপ্ন, হারানের নাত জামাই (নীরজ বিশ্বাস রচিত মিছিল, কাকের গল্প, আলোর যন্ত্রণা, দেবতার জন্ম) কাঞ্চন রঙ্গ, বোধন, উল্কা, লৌহ কপাট।
বঙ্গিয় নাট্য সংসদ	৬০এর দশক	পথিক, দুই পুরুষ
নাট্যচক্র	৬০এর দশক	কঙ্কাবতীর ঘাট ও অন্যান্য
জীবন বীমা রিক্রিয়েশন ক্লাব	১৯৬০	

শিল্পী মহল	১৯৬২	বিশ বছর আগে, রাত একটা, সৈনিক, রজনীগন্ধা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, তৃষ্ণা, বিচ, গড় ন্যাসিমপুর, ছায়ার মিছিল, পৃথিবীর কান্না, পদ্মানদীর মাঝি।
বর্ণালী	১৯৬৪	দুই পুরুষ, টাকার রং কালো, সাজাহান, মিশর কুমারী।
তরঙ্গ নাট্য গোষ্ঠী	১৯৬৪	সম্রাট, অমৃতস্য পুত্রী, ফেরা, ঝিঁঝিঁপোকার কান্না
গর্ভমেন্ট প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাব	১৯৬৫/৭০	বারুদে ফুলের গন্ধ
জেলা কালেক্টরেট অফিস	৪০/৫০এর দশক	সাজাহান, বৌদির বিয়ে, দুই মহল, বারোঘন্টা, রায়গড়, সাগ্নিক, বিবাদ নিবারণী মহৌষধ, গৃহ প্রবেশ, টিপু সুলতান, অন্য ছায়া, বিদিশা, তিলোত্তমা, লৌহ প্রাচীর, দাদা জন্মালেন, ক্রীতদাস, পতাকার রং লাল, এখনো অন্ধকার, গৌ গাবৌ গাবঃ, মধুরেন, সেমসাইড, মেস নং ৪৯, রাজ দর্শন, ঝিঁঝি পোকার কান্না, হইতে সাবধান, শেষ বিচার।
মহিলা মজলিশ	১৯৬৮	মানময়ী গার্লস স্কুল, কলেজে পড়াবৌ, বাইরের দরজা, রক্ত করবী।
তরুন সংঘ	১৯৬৮-৮৫	দুর্যোধন, আলো আঁধারে, নীলকন্ঠ, সূর্য এনে দাও।
প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী (পূর্বে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংসদ নামে পরিচিত)	১৯৭২	জ্বালা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুঁড়ো শালিখের ঘাঁড়ে রোঁ, আপনি কে, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, বিজয়া, হারানের নাত জামাই।
নিউ কদমতলা কালচারাল ক্লাব	৬০২০ দশক	ক্যাম্প থ্রি, বিদিশ, দুই মহল।
গুড়িয়াহাটি ক্লাব	৬০/৭০ দশক	একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা।
বিচিত্রা, নিউটাউন	১৯৮১/৮৬	প্রাগুক্ত

শক্তি সংঘ	১৯৭২	গরীবের ছেলে, (এই যুগ কিছু মুখ, স্বপ্ন আশাহীন, পিছিয়ে আঁধার, আলো আমার আলো, তৃতীয় পুরুষ - ভবেশ অধিকারী) একটি হীরের কাহিনী, দেবী চৌধুরাণী, আমি বিয়ে করব।
বৈশাখী	১৯৭৪	তোতলামি সারানোর স্কুল, বিশুর বিয়ে, চারমূর্তি, ছেনোদা, মানুষ মানুষের জন্য, পাথর, সাজানো বাগান, সূর্য নেই স্বপ্ন আছে।
ইন্দ্রায়ুধ গোষ্ঠী (প্রথমে ১৯৬৬ সালে বিবেকানন্দ ক্লাব ও পরে সুব্রত স্মৃতিসংঘ পরে এই নামে পরিচিত)	১৯৭৪	শতাব্দীর পদাবলী, দামস্ট্রং মূল্যাফস্কার অভিযান, হচ্ছেটা কী, হয়তো নয়তো, স্ফীংক্স, মহেশ, বিক্ষুব্ধ সৈকত, সারি সারি মৃতদেহ, বিদ্রোহী তেলেঙ্গানা, (দীপায়ণ ভট্টাচার্য রচিত - শত্রুর মুখোমুখী, ভূতের কেত্তন, পুতুল মেলা, কেলেংকারী কুমার, তেনাদের কীর্তি, ল্যাজেগোবরে, ময়লা ডাষ্ট বিনে ফেলুন, গন্তব্য, অদ্ভুতং, ঘোটকান্ড, আপতিক), মৃত্যু নেই, নোপাসারান, ঝড়ের খেয়া, আজও ইতিহাস, এল সালভেডর, সেথুয়া, অচিনবন্ধু, সৈন্য সৈন্য সৈনিক, প্রথম পাঠ (সাক্ষরতা বিষয়ক), কালকেউটে (ড্রাগনিয়ে), অদ্ভুতমঃ।
জাগরণী সংঘ	.....	.....
যুবতীর্থ ক্লাব	.....	.....
নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী	.....	.....
উত্তর নাট্য গোষ্ঠী, বকুলতলা		একটি অবাস্তব গল্প, মড়া, নোপাসারান, মিছিল, সত্যি ভূতের গল্প, অবরুদ্ধ ইতিহাস, পরবাস, ভিয়েতনাম।
থিয়েটার ইউনিট	১৯৭৪	ডাইনোসেরাস, কেননা মানুষ, বিপ্লবের গান, শববাহকেরা, ঠিক ঠিক বাবা, পাখী, এই সময়, তৃতীয় ব্যক্তির নিরাপদ গর্ত, সাজানো

		বাগান, দান সাগর, গদ্য পদ্য প্রবন্ধ, দুই হুজুরের গপ্পো, নোনাজল, চোখ, অবাস্তব, ক্যাপ্টেন হুররা, ঘরে ফেরার ডাক।
সুচেতনা নাট্য গোষ্ঠী	১৯৭৪	দুই তরঙ্গ, আসামী ফেরার, জটায়ূ সংবাদ, জিওদার্ণো, ব্রুনো, ভেলকির খেলা, রথচক্র, আলফাবেট ক্লাব, গগনে উদিল রবি।
বিচিত্র নাট্য গোষ্ঠী	১৯৭৫	বেকারের জ্বালা, এবার যুদ্ধ, ট্রোজান, আমি, কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ, ক্ষুদিরামের মা।
সপ্তর্ষি নাট্য গোষ্ঠী	১৯৭৬	(ইন্দুভূষণ ভদ্র রচিত - জন হেনরি, মুখোশ রণক্ষেত্রে একা, গলন্ত মানব) ধ্বস, দিশা, ভার্জিনিয়ার ঝড়, বিষমেরু, তক্ষক, ভোমা, নৈশভোজ, রাজা অয়দিপাউস।
সুশ্রুত সেবা সংঘ	১৯৭৭	লোকটা, মূক, লাঠি, শপথ (হীরেশ দাস রচিত - কারউ, চুপ, কেন)।
সময়ানুগ	১৯৭৮	বিছন, লেভেলক্রাশিং, জল, কালসাপ, গরম ভাত, জল, গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার, গৌ গাবৌ গাবঃ, মুক্তির রাইফেল, কলকাতার যিশু (পাগলা কুকুর - রচনা অমর চক্রবর্তী)।
নবলিপি নাট্য সংস্থা		(আমি বিয়ে করব - রচনা সুনীল সাহা)
উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া পরিষদ	৭০এর দশক	পানেশ্বরী
মেঘমল্লার	১৯৭৯	চিরকুমার সভা, পন্ডিত মশাই, অলীক বাবু, বল্লভ পুরের রূপকথা, বিসর্জন, সাজানো বাগান, (বিয়োগ - রচনা অমিয় ভূষণ মজুমদার) তিমিঙ্গিল - রচনা চারুচন্দ্র রায়।
আনন্দম	১৯৮০	জুতা আবিষ্কার, ব্যা, ঝালাপালা, গন্ধর্ব সিংমর গিয়া, দুধ পুকুর, গিরগিটি, আঁধার পেরিয়ে, চোর, টাপুর টুপুর, (তামাসা - রচনা শংকর দত্তগুপ্ত)।

দ্বান্দিক নাট্য গোষ্ঠী, হাজরাপাড়া	১৯৮১-৮৪	জ্বালা, শোলাপুর কমিউন।
ঐকতান নাট্য গোষ্ঠী	১৯৮১	মৃতজনে দেহ প্রাণ, তাহার নামটি রঞ্জনা, গৃহ প্রবেশ, বৈকুন্ঠের খাতা, ডাকঘর, কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ, সত্যি ভূতের গল্পো, বোধ, (প্রবঞ্চক - রচনা কিশোর পাইন)
ইঙ্গিত (১৯৯২ সালে কম্পাস নামে রেজিষ্ট্রিকৃত)	১৯৮৩	কেননা আমরা গোলাম, রক্তাক্ত নেলী, শূন্য কবর, ভরত, শহীদ বেদীর গল্প, নষ্ট বোধন, ৮১এর স্পার্টাকাস, অশ্বমেধের ঘোড়া, অগ্নি অতিক্রম, (অনৈতিহাসিক রচনা দেবব্রত ভট্টাচার্য) আদাব-এর নাট্যরূপ, আমোদ, হরিপদর পাঞ্জা লাড়াই (গ্যাট চুক্তি বিরোধী), চাকর দর্শন।
মাস থিয়েটার	১৯৮৪	মনের ব্যাধি, সীমান্তে আমি প্রহরী, গাব্বু খেলা, মহেঞ্জোদাড়োর খাজাঞ্চিখানা।
প্রতীক্ষা	১৯৮৫	তামাশা, লৌকিক রূপকথা, হনুয়াকা বেটা, নবনাট্য যুযুধান, মহাবিদ্যা, সারি সারি মৃত দেহ।
সংশপ্তক	১৯৮৭	নৈশভোজ, জামগাছ, সদগতি, মুখোশের স্বপ্ন লাভ, ব্রুণোথেকে হাসমি, রাজ পাখীর গল্প, জয়সিংহ, শেখো বন্ধু শেখো।
প্রতিশ্রুতি	৮০এর দশক	মনের ব্যাধি।
বর্ণনা		সাইক্লোন, সেনোরা কারার, বড় রাস্তা, ফিরে দেখা, হ্যামিলিনের বাঁশি, বান্দরখিলা, দানবের খেলা, অথ শ্রীপটল কথা। (বর্ণবিবর্ণ - রচনা তাপস সরকার)।
জনান্তিক নাট্য সংস্থা	১৯৯৮	
সংকল্প	১৯৯২	মোহনায়, আক্রান্ত, ঠিকানা।

নবশক্তি	১৯৯৩	বারো ভূতের বজ্জাতি, দুই হুজুরের গপ্পো।
অগ্নিনাট্য সংস্থা	১৯৯৪	চোখে আঙ্গুল দাদা, সন্ধ্যাতারা।
সংকেত	১৯৯৫	বিষমেরু।
তাকদুম, ঘুঘুমারী	১৯৮৩	একটি অবাস্তব গল্প, ভোরাই খেয়া, ঝালসানো রুটি, চোখে আঙ্গুল দাদা, রাজ দর্শন, তক্ষক।
শংকর ক্লাব, ঘুঘুমারী	----	----------
বিডিও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব, ঘুঘুমারী	----	----------
উদয়ন নাট্য সংস্থা, ঘুঘুমারী	----	----------
টাপুরহাট নাট্য গোষ্ঠী, টাপুরহাট	----	----------
প্রভাতী সংস্কৃতিক সংস্থা, টাকাগাছ	----	----------
জাগরনী সংঘ, মহিষবাথান	----	----------
নক্ষত্র নাট্য গোষ্ঠী, ট্যাঙ্গনমারী, রাজারহাট	১৯৭১	শাস্তি, রক্তে রোয়াধান, মুখেশের স্বপ্ন, ইতিহাস কাঁদে, একটি অবাস্তব গল্প।
যুবতীর্থ, রাজারহাট	----	----------
বাণেশ্বর কালচারাল ক্লাব, বাণেশ্বর	----	----------
পূর্বপাড়া ইউনিট, বাণেশ্বর	----	----------
জাগরণী সাংস্কৃতিক সংঘ, বাণেশ্বর	----	নাজি ৭৪, নোপাসারাণ।
ঝঙ্কার নাট্য সংস্থা, বাণেশ্বর	৬০এর দশক	আনন্দমঠ, গোলকুণ্ডা, রাজসিংহ, মেঘে ঢাকা তারা, টাকার রং কালো, বৌদির বিয়ে, ফিঙ্গার প্রিন্ট, অমৃতস্য পুত্রা।

বাণেশ্বর চৌরঙ্গী ইউনিট	১৯৬২	দূরভাষণ, অরণ্যর অর্বিকার, সংগ্রামে প্রতিদিন, ডাকঘর, বড় দারোগার বউ, উদ্ভুটে রাজার বিদ্ঘুটে কান্ড, যৌতুকে যৌতুক, বিষের বাঁশি, কাঁচের হীরে।
শ্রীকৃষ্ণ ক্লাব, দেওয়ানহাট	৫০এরদশক	----------
শ্রীকৃষ্ণ নাট্যনিকেতন - এটি পরে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে নাম পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় দেওয়ানহাট নাট্য সংঘ	১৯৫৫	শক্তির মন্ত্র , পাথরে চোখ, কেরাণীর জীবন।
দেওয়ানহাট প্রগতি সংঘ, দেওয়ানহাট	১৯৫৬	বুদ্ বুদ্, ছেলে কার, দেবতার গ্রাস, টিপু সুলতান, মেবার পতন, সিরাজদ্দৌলা।
প্রাচী, দেওয়ানহাট	১৯৬৬	সৈনিক, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ক্ষুধা, কেরানীর জীবন, পি-ডব্লু-ডি, সীতারাম, শিবাজী, মেবার পতন, কেদার রায়, (দানবের কবলে - রচনা হাফিজ উদ্দিন আমেদ)।
ছদ্মবেশী, দেওয়ানহাট	১৯৬৭	
কদমতলা ব্রিগেড, দেওয়ানহাট	১৯৬৮	স্ফিঙ্ক্স, বাজী, শতাব্দীর পদাবলী, শুয়োরের বাচ্চা, বৌদির বিয়ে, হাহাহাকার, ডাষ্টবিন।
স্বিকৃতি নাট্য গোষ্ঠী, দেওয়ানহাট	৯০এর দশক	----------
অরণী নাট্য সংস্থা, দেওয়ানহাট, দক্ষিণবালাসি		----------

তুফানগঞ্জ

১৫৬৮ সালে মহারাজ নরনারায়ণের ও চিলারায়ের পৃষ্ট পোষকতায় এখানে শঙ্কর দেবের নাটকটি প্রদর্শিত হয়

ড্রামাটিক ক্লাব	১৯২০	বিল্বমঙ্গল, বঙ্গে বর্গি, নির্বাণ, প্রফুল্ল, সাজাহান, শেষ রক্ষা, কেদার রায়, বৈকুন্ঠের উইল।

ইউনাইটেড ক্লাব	সম্ভবত ১৯৫৬	কয়লা কাটে যারা, ক্ষুধা, উল্কা, শেষ রক্ষা, মাটির ঘর।
বাণী সংঘ	১৯৬৮	ঘুটিয়ারী শরিফ, একটি গোলাপের মৃত্যু, শ্মশানে রক্তের দাগ, মেথরের ছেলে, রক্তে বোনা ধান, করণ দুসাদ, অথ স্বর্গ বিচিত্রা, যুগের হাওয়া।
পরিতোষ দে ও অন্যান্য	৬০এর দশক	দুই মহল, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, জিঘাংসা, মাটির প্রদীপ, ঐক্য (এটি তুফানগঞ্জ তথা জেলার প্রথম পথ নাটক)।
বিজয়া নাট্য গোষ্ঠি	১৯৭০	বস্তির ভাড়াটে, ঝড়ের রাত, মাধবী, (চক্রান্ত- রচনা - অজিত কুমার দে) ভাই দাদা (রচনা- অমল চক্রবর্তী)
নেতাজী এ্যাথলেটিক ক্লাব	১৯৭০	লক্ষণের শক্তিশেল, মুখ মাছি (আমরা স্বাধীন, জন হেনরী, বেইমান, কাকাবাবু রচনা- শচীন রায়।
মণিংষ্টার ক্লাব	১৯৭৯/৮০	মেঘে ঢাকা তারা, জালিয়াত, অন্ধ তামস, জনতার জয়, এক মুঠো ভাত।
সুকান্ত ক্লাব	৭০এর দশক	প্রতিরোধ, নিশানা, ডাক দিয়ে যাই (ক্ষুধা, সোনার মাথাওয়াল মানুষ - তরুন দাস)।
রানিং বুলেট্স ক্লাব	১৯৭১	ভারু দত্ত, তাহার নামটি রঞ্জনা, শতাব্দীর পদাবলী, কিন্তু নাটক নয়, আন্তিগোনে, সেই সুর, সমবেত সওয়াল জবাব, স্পার্টাকাস , মুক্তির ডাক, যদি আমরা সবাই, বিষ (কল্যাণময় দাস), চাকভাঙ্গা মধু।
বিবেকানন্দ ক্লাব	১৯৭৯	রক্তের ইতিহাস (ইন্দুমোহন গাঙ্গুলি), পন্ডিত-মুর্খ-ক্রীতদাস কথা, নক্সা, সনাতনের আত্ম দর্শন, অথ ব্যাঘ্র কথা, শেষ থেকে শুরু, যুযুধান, হজমশক্তি, কেনা কুসুমের কথা, ঘরেফেরা, এখনও অন্ধকার।

প্রত্যুষা নাট্য গোষ্ঠী	১৯৮১	রাজ দর্শন, কংক্রীট, সেতু বাগদী ও গোপাল কাহার, চাপাপড়া মানুষ, ভোরাই খেয়া, শতাব্দীর পাড়ে , কমরেড হাত নামাও।
প্রগতি নাট্য সংস্থা	১৯৮২	ঘেরাও, যদি আমরা সবাই, বিষুব রেখা, একটি অবাস্তব গল্প, ঝড়ের খেয়া, পৃথিবীর জন্য, নষ্টনীড়, মড়া, অথ কৃষ্ণ কলি কথা, নিঁখোজ চরিত, উপলব্ধি, নতুন দিনের সকাল, আওরত, কামলা ও কামলা বউ (তপন বর্মন), ক্রীতদাস।
সূর্যোদয় সব পেয়েছর আসর		
ঘুম পাড়ানো পাখীর আদর		
নিউ থিয়েটার মেকার্স	১৯৯৪	(এখন সময়, কোলাজ, এখন বসন্ত, স্বয়ম্বর - কল্যাণময় দাস)
শিকারপুর যুব সংঘ		
শহিদ ক্ষুদিরাম ক্লাব ও পাঠাগার	১৯৭০	ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না সহ ১৮টি নাটক
বিনয়-বাদল-দীনেশ ক্লাব, শিকার পুর	১৯৭৩	অন্ন যাদের নেই, ভোরাই খেয়া, মৃতজনে প্রাণ।
নাট্য বীথি, বক্সিরহাট		মিশর কুমারী, মায়ামৃগ।
বলরামপুর এ্যামেচার থিয়েটার পার্টি	৪০এর দশক	বঙ্গে বর্গী, দেবলা দেবী, মিশর কুমারী।
ভারতি নাট্য সংসদ, বলরামপুর	১৯৭৫	
ইয়ং ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব (টাউনক্লাব)	১৯১৮-২২	মেবার পতন, পথের দাবী, সরলা, বিন্দুর ছেলে, পরিণীতা, কর্ণাজুন।

দিনহাটা পাইওনিয়ার ক্লাব	১৯৩৯	কর্ণাজুন, এক রাত্রির ঘটনা (হরিশচন্দ্র পাল), দাঁড়িদিন,উটরোগ, রাত কানা, জামাই ষষ্ঠী, কঙ্কাবতীর ঘাট, মাকড়ষার জাল, পি.ডব্লু.ডি, মানময়ী গার্লস স্কুল, আদর্শ হিন্দু হোটেল, তটিনির বিচার, তাইতো , রাখী বন্ধন, সিন্ধু গৌরব, গয়াসুর, সম্রাটের মৃত্যু, দুঃখীর ইমান, কুহকিনী, ভূশন্ডির মাঠ, রামের সুমতি।
জুয়েলস্ ক্লাব, দিনহাটা	১৯৫৫	ম্যানিয়া, কেদার রায়, ছেঁড়াতার, ডাউন ট্রেন, ক্ষুধা, বারো ঘন্টা, পাবনাও, সন্ধ্যার রং, দুই মহল, ফেরারী ফৌজ, অমৃতস্য পুত্রা, সত্য মারা গেছে, শেষ থেকে শুরু, বাকী ইতিহাস, (ফেরিওয়ালা - প্রবোধ নাথ, ভূত দর্শন - সুবোধ তালুকদার) যা ভাবছেন তা নয়, কনসার্ট, মাচাং বনাম মছলা, উপিনের টেলি।
প্রগতি নাট্য সংস্থা, দিনহাটা	১৯৫৪ (নাটক ১৯৭১ থেকে)	জাগো বাংলা, ক্রন্দিত সূর্য (অলোক গঙ্গোপাধ্যায়), কেয়াকুঞ্জ, কালো মানুষ, মহাক্ষুধা, শতাব্দীর পদাবলী, যদি আমি কিন্তু আমি, ক্যাপ্টেন হুররা, টিনের তলোয়ার, আমি মন্ত্রী হব, ম্যাকবেথ-৭২, দ্বন্দ, আলিবাবার পাঁচালি।
বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব 'খ' শাখা, দিনহাটা	১৯৭৪	লক্ষণের শক্তিশেল, দৈত্য দানো ও দুষ্টু রাজা, ছুটি, আলিবাবা, সাচ্চা ভগবান, কাজির বিচার।
বয়েজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, দিনহাটা	১৯৭৪	রক্তে বোনা ধান, খুনী আসামী, অন্ধকারের নীচে সূর্য, রনদুন্দুভি, যদিও সন্ধ্যা, নরক গুলজার, চিচিং ফাঁক, বিবসনা বৃহন্নলা, মুকুট, নৈশভোজ, সাজানো বাগান, চন্দ্রগুপ্ত, শোভাযাত্রা, অন্য পৃথিবী, রক্তাক্ত নখর, হয় তো নয় তো, কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ, শেষ দৃশ্যে পৌঁছে, নোপাসারান, কোলকাতার যিশু, একটি অবাস্তব গল্প, রাজ অভিষেক। (পৃথা - সুপ্রকাশ সাহা)।

স্বাধীন ক্লাব	----	খুনী কারা, নেকড়ে, (পন-প্রদীপ সাহা কর্তৃক দেনাপাওনার নাট্যরূপ), ডাকঘর, (চন্দরা-প্রদীপ সাহা কর্তৃক শাস্তির নাট্যরূপ), (ঝড়-প্রদীপ রায়) (ফটিক - প্রদীপ সাহা কর্তৃক ছুটির নাট্যরূপ)।
সৌখীন নাট্য সংস্থা	১৯৬৭	আগামী ৭ই জুন, সম্রাটের মৃত্যু, ঝর্ণা, মরুঝঞ্ঝা।
সর্বহারা ক্লাব	১৯৬৯	চোখে আঙ্গুল দাদা, ধূমপান স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকর, (মহামিলন - শ্যামল চৌধুরী) শাহ আলমগীর।
বাঘা যতীন ক্লাব	১৯৭০	কুমারী মন, নেকড়ে, চাকভাঙ্গা মধু, দানসাগর।
মদনমোহন বাড়ি শিশু সংস্থা	১৯৭৩	মিঠুয়া।
এ্যামেচার ড্রামা ইউনিট	১৯৮২/৮৩	চাকভাঙ্গা মধু, প্রতিশ্রুত অভিমন্যু, মঞ্চ, এই যুগের এই সমাজে, মেষ ও রাক্ষস, ডাকঘর।
মুক্তধারা (এরা মূলতঃ থার্ড ফর্মের নাটক করেন)	১৯৮৪	পাভেল ফিরে এসো, কালো মুখোস, মেঘের আড়ালে সূর্য, ইতিহাস কাকে বলে, এই তো সময়, জিওদার্ণোব্রুনো, ড্রাগ বিরোধী নাটক, এখন প্রতিরোধ।
আঙ্গিক	১৯৯৪	গিরগিটি, আততায়ী, জেলে পাড়ার গান, (দিন-ইলাহি অচিন্ত্য সাহা)
অবহেলিত গোষ্ঠী, দিনহাটা	----	
নেতাজী ছাত্র সংস্থা, দিনহাটা	----	
মঞ্জির নৃত্য নিকেতন, দিনহাটা	----	
কিশোর সংঘ, দিনহাটা	----	
নব পল্লব সংস্থা, দিনহাটা	----	

বাণী ক্লাব, দিনহাটা	----	
নবারুণ সাংস্কৃতিক চক্র, দিনহাটা	----	
জুয়েলস্ ক্লাব, দিনহাটা	----	
স্বাধীন ক্লাব, দিনহাটা	----	
সোনার তরী, দিনহাটা	----	
বিজয়ী ক্লাব, দিনহাটা	----	
সুর ও ছন্দ, দিনহাটা	----	
কুহেলী সঙ্গিত মহাবিদ্যালয়, দিনহাটা	----	
অগ্রদুত সংঘ, দিনহাটা	----	
কাব্যনীড়, দিনহাটা	----	
শিল্পী সংসদ, দিনহাটা	----	
জয়ন্তী ক্লাব, দিনহাটা	----	
উদীয়মান সংঘ, নিগমনগর	৬০এর দশক	রক্তে বোনা ধান (কার অবিচারে - অজিত কুমার দে)।
সাথীহারা নাট্য গোষ্ঠী, নিগমনগর (১৯৮১ থেকে বলাকা নাট্য গোষ্ঠী)	৭০এর দশক	বিবর্ণ বিস্ময়, রাজার বাড়ি কতদূর, কিন্তু নাটক নয়, পাগলা ঘন্টি, আততয়ী, কেয়াকুঞ্জ, যদিও সন্ধ্যা, (বোধ - পথনাটক)।
মহিলা সমিতি, নিগমনগর	----	----------
রবীন্দ্র বিকাশ সংঘ, নিগমনগর	১৯৯০	রাইফেল, মুচির ছেলে, বৌদি, গণশত্রু।
জাতীয় সংহতি ক্লাব, নিগমনগর	----	এই তো সময়, ঘরগোশ, মোল্লার বিচার, তীরবিদ্ধ শিকার, মড়া, জগদ্দল, সোহাগের ঝগড়া, নৈশভোজ।

গিতালদহ পাবলিক রুরাল লাইব্রেরী	৭০এর দশক	ঝরাফুল।
লংলীভ স্পোর্টিং ক্লাব, গীতালদহ		ওয়াগন ব্রেকার, অনেক রক্ত মাড়িয়ে, রক্তে বোনা ধান, খুনী আসামী।
বামনহাটি যুব সংস্থা		(পদধ্বনি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মোক্ষ- তারা সাধন সিংহ)
কামতেশ্বরী ক্লাব, গোসাণীমারী	১৯৩৫	নতুন ইহুদী, আলঙ্গীর, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, গৈরিক পতাকা, দুই পুরুষ, যাত্রা হল শুরু, অরুন বরুন কিরণ মালা, রক্তে বোনা ধান, রিক্সা ওয়ালা, নতুন সাজাহান, বিক্ষুব্ধ জনতা, (বিংশ শতাব্দির অভিশাপ, চাকর- সমর সরকার), (নতুন দিনের ডাক, বিচার চাই কৃষ্ণ দাস সরকার)।
প্রগতি নাট্য সংস্থা, সিতাই	৭০এর দশক	----------
চৌরঙ্গী ক্লাব, সিতাই	১৯৭৩	বিদিশ, ছেঁড়া তার, কেনা রাম বেচা রাম, নরক গুলজার, বৈকুন্ঠের খাতা,
সপ্তরঙ্গী নাট্য গোষ্ঠী, সিতাই	----	----------
উপেন্দ্র নাট্য গোষ্ঠী, সিতাই	----	----------
রেঁনেসাস ক্লাব, সিতাই	----	----------
ইয়ং কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন, সিতাই	----	----------
সান রাইজ ক্লাব, কেশরীবাড়ি, সিতাই	----	----------
বিবেক সংঘ, ধূমের খাতা, সিতাই	----	----------
জাগৃতী সংঘ, আদাবাড়ি, সিতাই	----	----------
অবসর রঞ্জনী / অবকাশ রঞ্জনী ক্লাব মাথাভাঙ্গা	১৯১১	নরনারায়ণ (?)
[illegible] ক্লাব	১৯৬০	[illegible]
এমপ্লয়ীজ ক্লাব, মাথাভাঙ্গা		বিজয়া।

অফিসার্স রিক্রেয়েশন্ ক্লাব		ফাঁস, কবি কাহিনী, উল্কা , টিনের তলোয়ার, ফেরারী ফৌজ, সত্য মারা গেছে, এম. ঘোষের মা, শাহজাহান
[illegible]		[illegible]
ধুমকেতু গোষ্ঠী, মাথাভাঙ্গা	১৯৬০/৬১	দুই মহল, অনান্য কয়েকটি
পূর্বপাড়া এ্যাথলেটিক ক্লাব	১৯৬৫	পাগল, উত্তাল, তরঙ্গ, ক্যাম্পথ্রী
এ. বি.সি, ক্লাব	১৯৬৫/৬৬	অচল টাকা চলছে, ক্যাম্পথ্রী, রং মহল, বাবার বিয়ে, বিশ বছর পরে, অশান্ত বিবর, চোখে আঙুল দাদা
অনুঢ়া গোষ্ঠী (মহিলা নাট্য গোষ্ঠী)		(পুতুলের দোকান- অলক ধর), তপস্যা, লক্ষীর পরীক্ষা, নীল সাগরের নীচে, কেনারাম বেচারাম
অনুঢ়া গোষ্ঠী (শিশুশাখা পুতুল গোষ্ঠী)		জনরব, পরের উপকার, ফেরিওয়ালা, দেবতাদুর ভয়, কবির লড়াই
অনুঢ়া গোষ্ঠী (শিশুশাখা পুতুল গোষ্ঠী)		জলকে ভরনে, রামের সুমতি (ছায়ার আসন পাতি- কাব্য নাট্য অলক ধর), তবে কেমন হত, বিন্দুর ছেলে, সীতার বনবাস, বিপ্রদাস, কর্ণকুন্তী সংবাদ
[illegible]		[illegible]
অবহেলিত গোষ্ঠী	১৯৬৮	শিক্ষক, ভিক্ষুক, রক্তে বোনা ধান, রাজার বাড়ি কতদূর, স্ফিংক্স, মহেশ
ঝংকার ক্লাব	১৯৬৮	বাঁধবে লড়াই, হত্যা দেবালয়ে,রাজা মশাই আসছে তেড়ে, দখল অবলম্বনে ' নুন পান্তা', এবং আমরা, সুতরাং আমরা, স্বপ্ন পুরীর পথে
শিশু মেলা	৬০ দশক	অভাগীর স্বর্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ , (দেবতার গ্রাস) অভিশাপ-ছায়া নাটক), চাঁদের দেশে- (মুখোশ নাটক)
মনি মেলা	-	-
মাথাভাঙ্গা মেডিক্যালস্টাফ	-	ডাউন ট্রেন
আশুতোশ ক্লাব		বিল্বমঙ্গল,কর্ণাজুন, মেবার পতন, টিপুসুলতান নরনারায়ন, বির্সজন চির কুমার সভা, পথের দাবী

শৈলেশ অমল স্মৃতি নাট্যসংস্থা	১৯৭৩	রক্তকরবী, বিসর্জন, পুতুল নাচ, নহবত, ইতিহাস কাঁদে হইতে সাবধান, বিবর্ণ বিস্ময়, জয় মাকালি বোর্ডিং, পাগল ঠাকুর, তেঁতুল গাছ, নরক গুলজার
সপ্তরথী ক্লাব	–	
বিচিত্রা, মাথাভাঙ্গা	১৯৭৭/৭৮	ভূমিকম্প, শতাব্দীর পদাবলি, রাজ অভিষেক, অথ স্বর্গ বিচিত্রা, সারি সারি মৃতদেহ
নান্দনিকী,"	১৯৭৮	দুখী চামারের কুঠার, বহুরূপি, ভোরাইখেয়া, ডাকঘর ,অশ্বত্থামা
নবজীবন সংঘ	১৯৮২	দ্রব্যগুন (একদিন প্রতিদিন- পিনাকী চৌধরী)
গিলোটিন	১৯৮৩	পাঁচু পালের পাঁচালি, শার্দুল, অথ কুসুম কথা মড়া ,গনশত্রু ,গৃহযুদ্ধ, পাকে বিপাকে,নরক গুলজার, মর্জিনা আবদাল্লা, দুঃসময়, পুতুল ঘর, ফায়ার ফুয়েরো, এক কুবেরের কেচ্ছা,হেনিপদ, কুকুর,হে সহযোদ্ধা, গ্যালিলিও ,তুতেন খামেনের মমি, জুলিয়াস সিজার, (জাগছে মানুষ - সুব্রত রায়) স্বরবর্ণ, বুকিং চলিতেছে, (বেনামী অঞ্জন দেবের ওয়ার্কশপ উঠে আসা নাটক।।
তির্থক সংস্কৃতি সংস্থা, পচাগর	১৯৮৫	লিফ্টিং, ডাকঘর, পনপ্রথা- কম্পন সরকার প্রতিশোধ- মাখন সরকার
এভারগ্রীন ক্লাব	১৯৯০	রাজিব ডাকুয়া লিখিত দুটি নাটক
মুক্তধারা	–	——
চারুশিলা	—	——
অজিতগুহ ও তার গোষ্ঠি	—	——
শতাব্দি	—	——

জাগৃতি সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার	১৯৫৩	রানার, গুপ্ত বিদ্যা, মহেশ, ডাকঘর, ঘুর্ণি আজবশহর, গোঁসাইর হাট, কলকাতা, অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ, দেনাপাওনা, ছেঁড়া কাগজ, মুখর রাত্রি, শকুন্তলা (নারী কেন্দ্রীক নাটক)
গোঁসাইর হাট রামকৃষ্ণ সংঘ	১৯৮৪	গরীবিহটাও রক্তে বোনাধান, ধাক্কা, পুরস্কার (কলকী পুরণ- অধ্যাপক হীরেন চট্যোপাধ্যায়, খেলা - বিপ্লব রক্ষিত)
গোসাইরহাট ব্রাদার্স ইউনিট	৮০দশক	কিন্তু নাটক নয়
কেন্দ্রীয় ইন্সপেকটর কেশব ভট্যাচার্য ও তার দল, শীতলকুচি।	—	বিসর্জন, ঝিন্দের বন্দি, মিশরকুমারী
উদয়ন সংঘ	১৯৫২	ক্যাম্প থ্রী, ডাকঘর, মুকুট, বৈকুণ্ঠের খাতা, অশ্বথামা, জরাসন্ধের সিংহাসন, হইতে সাবধান
দেশবন্ধু ক্লাব	১৯৭৫	মারীচ সংবাদ, বিসর্জন, শতাব্দীর পদাবলী, ফ্লু, হইতে সাবধান
জামালদহ ক্লাব ও পাঠাগার	১৯৮২	রক্তকরবী, ম্যাকবেথ৭২, চাকভাঙ্গা মধু নৈশভোজ, নরকগুলজার, মেষ ও রাক্ষস
রক্ষাকালি নাট্য সংস্থা চ্যাংরাবান্ধা	১৯৪৮	পথের শেষে
চ্যাংরাবান্ধা ক্লাব লাইব্রেরী		সোনার হরিণ, বিবাহ বিভ্রাট, দেয়ালে পিঠ রেখে নতুন মানুষ, চন্দ্রগুপ্ত, সিরাজদৌল্লা, ৪২ এর বিপ্লবে আমি, কোলকাতার যিশু
প্রগতি নাট্য সংস্থা	—	রক্তেবোনা ধান, ইতিহাস কাঁদে , হইতে সাবধান, তাহার নামটি রঞ্জনা
সৌখিন নাট্য সংস্থা	—	সকলের জন্য, ওয়াগন ব্রেকার, প্রমত্ত প্রভঞ্জন, বিবর্ন
সোনালি নাট্য সংস্থা	—	মা, মৃত্যুর চোখে জল, (আলোর সাথী - নমিতা সরকার, সাক্ষরতা বিষয়ক

মনমোহন নাট্য সমিতি, মেখলিগঞ্জ	—	গয়াসুর, কর্ণার্জুন, মন্ত্রশক্তি, বঙ্গেবর্গি, রেশমী রুমাল, কেদার রায়
মহিলা সমিতি	১৯৫৬/৬০	ডালিয়া, শ্যামা, তাসের দেশ, প্রায়শ্চিত্ত, ধৃতরাষ্ট
নৃপেন্দ্র নারায়ন মেমোরিয়াল ক্লাব		শতাব্দীর স্বপ্ন, পরোয়ানা, তাহার নামটি, একপশলা বৃষ্টি, বারো ঘন্টা, দাম্পত্য কলহের, সম্রাটের মৃত্যু, বিজয়া, পথের দাবী, দুই পুরুষ নতুন ইহুদী, বিশবছর আগে, ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট
যাযাবর গোষ্টি	—	কলেজ হোটেল, কালো মাটির কান্না, ক্যাম্প ত্রী, ফাঁস, ডালিয়া, রেওয়াজ, রোশনী
কালিন্দী গোষ্টি	৬০ দশক	কালিন্দী, লৌহকপাট
উদয়ন সংঘ	১৯৬৮	রাজযোটক, বৈকুণ্ঠের, খাতা, কাঞ্চন বন্দর, যা - তারা পারেনি, সারি সারি পাঁচিল , সমুদ্র সন্ধান
অনামিকা ক্লাব	৭০ দশক	দোহাই হাসবেন না
ফাইটিং ব্যাক	১৯৮২	হোমো স্যাপিয়েন্স, ক্রীতদাস নেকরে, রক্তকরবী, মেষ ও রাক্ষস, নৈশভোজ, কিনু কাহারের থেটার, চাকভাঙ্গা মধু
মনোজ চক্রবর্তী ও রবীশঙ্কর বর্ধন চৌধরীর গোষ্টি		বিসর্জন
পি.ভি.এন.এন. লাইব্রেরী, হলদিবাড়ী	১৯৪৬	বিল্বমঙ্গল, দেবলাদেবী, সীতা মিশরকুমারী বঙ্গে বর্গী, চন্ডিদাস, সিন্ধু গৌরব, সিরাজদৌল্লা, কর্ণার্জুন, কেদার রায় , রনজিৎ সিংহ
কিশোর (পরে পি.ভি.এন.এন এ. মিশে যায়)	১৯৪৬	উৎসব, বিদ্রোহ, পন্ডিত বিদ্যায়, পুরস্কার সিরাজের স্বপ্ন,
ইউনাইটেড ক্লাব উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ী	১৯৫৭	হলদীঘাট, ভক্তপ্রল্লাদ, মহাপুজা করবো, মেঘ, স্নেহের জয়, বারো ঘন্টা, রক্তকরবী, দর্শন,
সান্ধ্য বৈঠক	১৯৬০	ডাউন ট্রেন, সংকেত

ইউনিক ক্লাব শান্তি নগর, হলদিবাড়ী	১৯৬০	(শপথ- রবীন্দ্রনাথ রায়, প্রভাতের সাক্ষর শঙ্কর নিয়োগী
শিল্পী গোষ্ঠী	১৯৬২	বিসর্জন, অচলায়তন,শারদোৎসব, ডাকঘর, তাসের দেশ, সম্পত্তি, সমর্পন, মুকুট বিদুত্যের খাতা, অবিচার
তরুন সংঘ হলদিবাড়ী	১৯৬৫	গুলশন, পুরস্কার
চতুরঙ্গ ক্লাব হলদিবাড়ী	১৯৭০	ষ্ট্যাচু, তক্ষক
পশ্চিমপাড়া এ্যাথলেটিক ক্লাব	১৯৭১	শতাব্দীর পাড়ে, চলো সাগরে
সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব হলদিবাড়ী	১৯৭১	ঘরেফেরা,কোজাগরী
আননোন ফ্রেন্ডস ক্লাব, পূর্বপাড়া, হলদিবাড়ী	–	হইতে সাবধান, হয়তো নয়তো,
প্রগতি যুব সংস্থা	১৯৭১	সোনালি স্বপ্ন, সভ্যতার দূত, খাদ্য সমস্যার সমাধান,অভিযান, খ্যাতির বিড়ম্বনা, দেবতার ভয়,আঠারো বছরের যৌবন
হলদিবাড়ি থিয়েটার সেন্টার	১৯৭১	ফাঁস, রাজরক্ত, মারিচ সংবাদ, পড়বাস, পার্থসারথী, স্বরবর্ণ, শতাব্দীর পদাবলী, কাঞ্চন রঙ্গ, ক্যাপ্টেন হুররা,
বান্ধব সমাজ, হলদিবাড়ি	১৯৮৫	অনুতাপ,গুলশান,কালা বিহার পুরস্কার, ডাকঘর,অরাজনৈতিক (আজকের অভিমন্যু, আলোয় ফেরা- চন্দন রায়)
অগ্নিবীনা	১৯৮৭	একই বৃন্তে, গুলশান, যুদ্ধ শুরু আজ, চেনা মানুষ (কীর্তিবাবুর প্রত্যাবর্তন - সুব্রত দত্ত)
ইন্দ্রনাথ নাট্য গোষ্ঠী	১৯৯২	প্রশ্ন করা(পথনাটিকা) রক্তে বোনা ধান, লণ্ঠন, মেশিন, ঝড়ের পাখি, আর আন্ধারে লয়, ইন্দ্রনাথ (মানুষ কে- উত্তম কুমার রায়), এক দিন রেষ্টুরেন্টে, দুই হিন্দুস্থানি, ফটিক লাল
প্রয়াস	১৯৯৩	নিহত শতাব্দি,দুই হুজুরের গপ্প, সন্ধাতারা

কোচবিহারের যে সমস্ত নাট্যকারের নাটকগুলি বিভিন্ন নাট্য সংস্থায় অভিনীত হয়েছে অথচ প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয়নি তাদের তালিকা নাচে দেওয়া হল

নাট্যকারের নাম ঃ	নাটকের নামঃ
১। সমর বসু	তোমার সমাধিতে, খুনি, বেকার
২। তপেন্দ্র লাল দাস	পরিচয়, বন্ধু, পঞ্চপান্ডব
৩। রবীন্দ্রনাথ রায়	শপথ
৪। শঙ্কর নিয়োগি	প্রভাতের স্বাক্ষর
৫। চন্দন রায়	আজকের অভিমুন্য, আলোয় ফেরা
৬। সুব্রত দত্ত	কীর্তিবাবুর প্রত্যাবর্তন
৭। উত্তম কুমার রায়	মানুষ কে, একদিন রেষ্টুরেন্টে, দুই হিন্দুস্তানি
৮। কিশোর নাথ চক্রবর্তী	ধাক্কা (দেবেশ ঠাকুরের নাটকের রাজবংশী ভাষান্তর, অভ্যন্তর, বৃন্দাবনের বিপ্লব
৯। জনার্দন ভট্টাচার্য	কয়লা কাটে যারা
১০। চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়	মা
১১। পিনাকী চৌধরী	একদিন প্রতিদিন
১২। অজিত কুমার দে	কার অবিচারে
১৩। মনোরঞ্জন ঘোষ	সমুদ্রে চলো
১৪। অমিনুর রহমান	শেষ চিঠি (পনপ্রথাবিরোধী), মুকুল (সাক্ষরতা বিষয়)
১৫। মজরুল হক	অঙ্গিকার, হাতিয়ার
১৬। প্রফুল্ল সরকার	বুড়াতি বয়সে দোতরা (রাজবংশী উপভাষায়)

১৭। তারাসাধন সিংহ	পদধ্বনি, ধম্মকম্মমোক্ষ
১৮। কৃষ্ণ দাস সরকার	নতুন দিনের ডাক, বিচার চাই
১৯। অধির ধর	(বিরিঞ্চিবাবা- পরশুরামের নাট্যরূপ)
২০। অলক ধর	নেশার কান্না, কান্নার ওজন,
	বিদেহ বিকল্প, নাটক করার
	নাটক, বৌঁচ্চি পিসির গোঁফ, পুতুলের দোকান
	ছায়ার আসন পাতি
২১। অঞ্জন কুমার পাল	রাজামশাই আসছে তেড়ে, নুন ভ াত
	(দখল অবলম্বনে)
২২। পিনাকী চৌধরী	একদিন প্রতিদিন
২৩। বিমান ভট্টাচার্য	ফায়ার ফুয়েরো, এক কুবেরের কেচ্ছা,
	হে সহযোদ্ধা, গ্যালিলিও, তুতান খামেনের
	মমি, জুলিয়াস মিজার
২৪। সুব্রত রায়	ঝঞ্ঝা, আক্রান্ত, বিসভোনি, জাগছে মানুষ
২৫। অঞ্জন দেব	বোনাস (পূর্নাঙ্গনাটক)
২৬। কঙ্কন সরকার	পনপ্রথা
২৭। মাখন সরকার	প্রতিশোধ
২৮। রাজিব ডাকুয়া	২টি নাটক কিন্তু নাম পাওয়া যায়নি
২৯। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়	নবজাতক, কল্কিপুরান
৩০। বিপ্লব রক্ষিত	খেলা
৩১। শ্যামাপদ বর্মন	প্রতিশ্রু তি, সকাল সন্ধা
৩২। নমিতা সরকার	আলোর সাথী (সাক্ষরতা বিষযক)
৩৩। সুবল গুহ	—
৩৪। পূর্বাচল দাশগুপ্ত	চোখ, অবাস্তব
৩৫। পার্থপ্রতিম সমাজদার	রথচক্র
৩৬। ইন্দুভূষন ভদ্র	জনহেনরি, মুখোস, রণক্ষেত্রে একা, গলন্ত মানব

৩৭। হীরেন দাস	কারুউ, চুপ কেন
৩৮। অমর চক্রবর্তী	পাগলা কুকুর, গরম ভাত(নাট্যরূপ)
৩৯। চারু চন্দ্র রায়	তিমিঙ্গিল
৪০। নারায়ন চট্টোপাধ্যায়	এবং নৃত্যেমিস রূপালি, সংগ্রাম
৪১। কিশোর পাইন	প্রবঞ্চক
৪২। তাপস সরকার	বর্ণ বিবর্ন
৪৩। দেবব্রত ভট্টাচার্য	কেননা আমরা গোলাম, রক্তাক্ত নেলী, শহীদ বেদীর গল্প, নষ্ট বোধন, ৮৫ র স্পার্টাকাস, অশ্বমেধের ঘোড়া নই
৪৪। প্যারি মোহন দাস ও টিকেন্দ্রজিৎ ইশোর	শিক্ষার ডাক(সাক্ষরতা বিষয়ক)
৪৫। শচীন রায়	আমরা স্বাধীন, জনহেনরী, কাকাবাবু, বেইমান
৪৬। তপন বর্মন	কামলা ও কামলা বউ
৪৭। কল্যানময় দাস	প্রশ্ন এখন সময়, কোলাজ, এখন বসন্ত
৪৮। হাফিজউদ্দিন আমেদ	দানবের কবলে
৪৯। প্রবোধ নাথ	ফেরিওয়ালা
৫০। সুপ্রকাশ সাহা	পৃথা
৫১। সুবোধ তালুকদার	যা ভাবছেন তানয়, কনসার্ট, মানুষ খেকো, ভূতদর্শন, উপিনের টেলি
৫৩। শ্যামল চৌধুরী	মহামিলন
৫৪। শাহআলমগীর	সাক্ষরতাবিষয়ক নাট্য
৫৫। অচিন্ত সাহা	দিনইলাহী
৫৬। অশ্রুমান দাশগুপ্ত	ঝরাফুল

৫৭। পানু পাল	বিচার (১৯৫১ র খাদ্য আন্দোলনের উপর)
৫৮। রজত বরণ রায়	কয়লা কাটে যারা (অনুবাদ,) মহেশ (নাট্য রূপ)
৫৯। জ্যোতি রিন্দ্র ভট্টাচার্য	প্রিয়তমাসু, ভগীরথ, কালোমানুষ ।
৬০। নির্মল দে	মানষপুরী (বিজ্ঞানের অপব্যবহার নিয়ে) ব্রুনোথেকে হাসমী, রাজ পাখীর গল্প, জয়সিংহ রাজপুরীর গল্প, শেখো বন্ধু শেখো (সাক্ষরতা বিষয়ক) ।
৬১। নিরজ বিশ্বাস	মিছিল, কাকের গল্প, আলোর যন্ত্রনা, দেবতার জন্ম ।
৬২। অশোক ব্রহ্ম	কালকেউটে (ড্রাগ বিরোধী) ।
৬৩। প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়	সেনা সেনা সৈনিক (যুদ্ধ বিরোধী) ।
৬৪। দীপায়ন ভট্টাচার্য	শত্রুর মুখোমুখী, ভূতের কেওন, পুতুল খেলা, কেলেংকারী কুমার, তোদের কীর্তি, ল্যাজে গোবরে, ময়লা ডাষ্টবিনে ফেলুন , ঘোটকান্ড ।

জেলার যে সমস্ত নাট্যকারের নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাদের নাটকের মূল্যায়ণ করা যাচ্ছে ।

অনিল কুমার দাস

অনিল কুমার দাস রচিত 'নন্দিনী' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছে মাথাভাঙ্গা থেকে প্রকাশিত 'ঋতুপত্র' পত্রিকার ১৩৮০ বঙ্গাব্দের ২য় বর্ষ শারদীয় বিশেষ সংখ্যায়। আঠারো পৃষ্টার এই ক্ষুদ্র একাংক নাটকটির পটভূমি হল ভারত সীমান্তে বিদেশী আক্রমন ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসে তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্দিপণাকে কেন্দ্র করে। সীমান্তে বিদেশী আক্রমনের প্রেক্ষাপটে চিরদিন সব দেশে দেখা দেয় দেশ প্রেমের জোয়ার। শিশু বৃদ্ধ ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে সবাই হয় তার শরিক। আলোচ্য 'নন্দিনী' সেই সত্যেরই প্রতিফলন। এখানে বিশেষত্ব হল অন্যান্য ছাত্রীরা যখন নিজ নিজ গহনা দান করে, চা পান করে না এমন কি ছাত্রী নিবাসের মেয়ে কর্মী গোপালের মা যখন মৃতা কন্যার গয়না প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে সরবে দেশ প্রেম জানান দেয় তখনও নন্দিনী চরিত্র আপাত নির্বিকার,এমন কি সে অন্যদের ন্যায় চা পান ত্যাগ করতে রাজী হয়নি, নির্বিকল্প ভাবে সহ্য করেছে সবার শ্লেষ। অথচ সে চুপি চুপি তিন বার রক্তদান করেছে। সেই শারিরীক ক্ষতির ক্ষতি পূরণ করতে গিয়ে সে জল খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে চা পান করাকেই একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহন করে। শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকার বান্ধবি ডাক্তার মিসেস মুখার্জী এসে সব তথ্য প্রকাশ করায় সবাই অনুতাপে বিদ্ধ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সিমান্তে যুদ্ধ রত আপন সহোদর ভ্রাতার মৃত্যুতে বিদেশী আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে নন্দিনীর দৃপ্ত শপথ গ্রহনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি হয়। আঠারো পৃষ্ঠার এই নাটকটিতে মোট চরিত্রের সংখ্যা হল বারোটি। ১৯৪৭- ১৯৭৩ এই সাতাশ বছরে ভারত উত্তর পুর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে মোট চারবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কোন সময়ের যুদ্ধকে নিয়ে নাটকের ঘটনাক্রম আর্বতিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বলা না হলেও সম্ভবত দুই বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭১ সালে সংঘটিত ভারত-পাক যুদ্ধই নাটকের পটভূ মি হিসাবে কাজ করেছে। সমগ্র নাটকটিতে নাট্য কারের দেশ প্রেম সৃষ্টির ও তার প্রদর্শনের প্রয়োজনে আবেগ বিহ্বলতা যত স্পষ্টহয়েছে, চরিত্র গুলি সেই অনুসারে বাস্তব অনুসারী হয়নি। যেমন- আরতি " আচ্ছা দিদিমনি, আপনিই বলুন জাতির শত্রুকে রুখতে জওয়ান ভাইরা যারা প্রান দিচ্ছে, আর আমরা সামান্য চায়ের অভ্যাস ছাড়তে পারবোনা, এটা তো অতি তুচ্ছ ত্যাগ '(নন্দিনি-ঋতুপত্র) বলা বাহুল্য চায়ের অভ্যাস ত্যাগ করে, সেই অর্থ প্রতিরক্ষা ভান্ডারে দ ান করার মধ্যে যত আবেগই থাকনা কেন তা যে ত্যাগ হিসাবে অতি সামান্য তাতে কোন সন্দেহে র অবকাশ থাকেনা। এমন কি বন্দনার উক্তির মধ্যেও তা প্রতিফলিত, আমরা দুবেলা পেটপুরে জলখাবার খাচ্ছি আর চা ছেড়ে দিয়ে দেশ প্রেমের পরাকাষ্টা দেখাচ্ছি।)দেশ প্রেম নয় অনেক ক্ষেত্রে তার ভঙ্গিমাই বড় হয়ে দ াড়ায় বন্দনার উক্তির মধ্যে লেখক চেতন অথবা অবচেতন যেভাবেই হোক এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

নন্দি নীচরিত্রটি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদ ান করে তাব বাবা আর সীমান্তে দেশ রক্ষায় যুদ্ধে যোগ দিয়ে তার দাদা নিহত। পরিবারের সক্ষম পুরুষ ও সেই সময়ের তাদের আশা ও ভরসা তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অকাল মৃত্যুতে নন্দিনী র প্রতি -

(সেন।। কাদিস নে নন্দিনী, দাদা দেশের জন্য প্রান দিয়েছেন, এতো গৌরবের কথা।"
সেন ।। দেশের গৌরব রক্ষার জন্য বেশী মূল্যই দিতে হয় তার জন্য দুঃখ কিরে.....'
নন্দিনী।। কিন্তু আমাদের যে আর ভাই নেই, দিদিমনি'

প্রমান করে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে যে প্রিয়জন বিচ্ছেদ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে কোন সান্তনা বা আদর্শের বানীতে তার ক্ষতিপূরণ হয়না। যদিও শেষে ' না আমি আর কাঁদবো না' বলে নন্দিনী তার চোখেরজল মুছে ফেলেছে তবুও তা যেন নাটকের মহান পরিসমাপ্তি র জন্য কষ্ট কল্পিত বলেই মনে হয়। তবে নাটকের প্রথম পর্বে যখন হষ্টেলের সুপার বলেন "এই মেয়েরা এত হল্লা কিসের? একি? মানে ইয়ে এখানে কেন? (টেবিলের উপর কুমড়ো দেখান) এবং উত্তরে সবাই হাতের আড়াল দিয়ে হাসি গোপন করে তখন চরিত্র গুলি যেন স্বাভাবিক ও সজীব হয়ে উঠে। যাই হোক সামগ্রীক পর্যালোচনায় বলা যায়, বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্ষার প্রয়োজনে দেশপ্রেম জাগা বার চেষ্টা করার জন্য নাটকটি যতই মূল্যবান হোকনা কেন নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি অথবা চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধের মানদন্ডে নাটকটির মূল্য অকিঞ্চিৎকর বলা যায়।

সুবোধ তালুকদার

সুবোধ তালুকদারের প্রকাশিত নাটক ' মাচাং বনাম মছলা' য় সাম্প্রদায়িক ভেদ - বুদ্ধির উর্দ্ধে সম্প্রীতির সুরধ্বনিত হয়েছে। সাহিত্যপত্র নবলিপি'র শারদীয়া ১৪০১ সংখ্যায় প্রকাশিত এই নাটকের বৈশিষ্ট হল নাটকটি স্থানীয় রাজবংশী উপভাষা যা কোনও কোনও গবেষকের মতে কামরূপি উপভাষা বলে গন্য সেই উপভাষায় লেখা নাটকের বিষয় বস্তু হল জনৈক মৃতপ্রায় বৃদ্ধাকে মৃতাভ্রমে তার মৃতদেহের শেষকৃত্যের প্রয়োজনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যাক্তিদের পারস্পরিক বিরোধ। সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে বৃদ্ধার মৃতদেহ খাটিয়া বা মাচায় অথবা মুসলমানদের মৃতদেহ বহন করার কফিন বা যা স্থানীয় ভাষায় মছলা বলে গন্য তার কোনটিতে উঠানো হবে সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে রক্তস্নানের উপক্রম হয়। কিন্তু মুর্চ্ছা থেকে বৃদ্ধার আকস্মিকভাবে সম্বিত লাভে র পর উভয় সম্প্রদায়ই হানাহানী থেকে বিরত হয় এবং প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত হয়ে চিরন্তন মনুষ্যত্ব বোধে স্থিত হয়। সমগ্র নাটকে মূল চরিত্র আছে এগারোজন, তাছাড়ও হিন্দু ও মুসলমান সমবেত চরিত্রেও কয়েকজন আছে যারা নির্দিষ্ট ভাবে কোন নামে নামাঙ্কিত হয়নি। রাজবংশী উপভাষায় রচিত হওয়ার ফলে প্রতিটি চরিত্রের সংলাপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতসহজ ও স্বাভাবিক। বিশেষ করে এতদ ঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষগুলি তাদের সংস্কার আবেগ ও ক্রোধ নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই চিত্রিত হয়েছে। যেমন হাফিজ - খবদ্দার আর আগে হইলে কিন্তুক রক্তারক্তি হয়্যা যাইবে। শুটকু - কি এ্যাতে জোকো কথা । আইজ হয়্যায় যাউক যাহবার। আগাও রে (২-১৩ মাচাং বনাম মছলা- ডঃ সুবোধ তালুকদার সাহিত্য পত্র শারদীয় -১৪০১)

আবার যখন মুর্ছিত অবস্থা থেকে সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর আইওবা দাদা বলে পরিচিত বুড়ি যখন বলে 'আইছা তোমরা গুলান কি রে এ্যা । একটা মড়াকধরি ডাঙ্গাডাঙ্গি করিয়া কয়টা বা মড়া হবার ধচ্ছিলু।' তখন তা যেন চেতনায় চাবুকের কশাঘাতের মতই প্রদাহ সৃষ্টি করে। অথবা 'বুড়ির জাইত আরো নাথাকে ক্যানে ? যে জাইত হয়্যা পৃতিবীত আইছে সেই জাতকোনা কি ছাড়ির পায়' তখন তা যেন সবাই কে নিরব আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি ঠেলে দেয়। "সোমনেয় তাইলে হামরা যে মোছলমান আর ওমরায় যে হেঁদু এইল্যা আল্লা আল্লা করে নাই " মংলাটির উত্তরে বুড়ির "নাই করে এইল্যা কতগুইল্যা মানষির ফায়দা লোটার কায়দা।" সংলাপটিপাট ধর্মীয় বিরোধের আড়ালে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ ভাবনার স্বরূপ কে স্পষ্ট করে ।

কিন্তু পরবর্তীস্তরে যখন বুড়ি বলে ' মশায় আইসেক তো মোর কালত, ধরেক হাত' (পৃ- ১৫)

বলার পর হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে তখন জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মেবার পতন ' নাটকের আবছা ছায়াপাত লক্ষ্য না করে পারা যায়না । বিশেষ করে রাজবংশী ভাষায় সংলাপ রচনা করে নাটকটি অনেক দূর পর্যন্ত স্বাভিবকতা বজায় রাখলেও শেষ দৃশ্য লালন গীতি পরিবেশিত হওয়ায় নাটকের উদ্যেশ্য যতই মহৎ হোকনা কেন মিলন দৃশ্য কে সযত্নে আরোপিত এবং ফলতঃ কৃত্রিম বলে মনে হওয়াটা দর্শক সাধারনের কাছে অস্বাভাবিক নয়। সুবোধ তালুকদার আর পাঁচটি নাটক প্রকাশ করেছেন যে গুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও সময়ন্তরে বিভিন্ন সাময়িক পত্রও মুখ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'ভূতদর্শন' (পাক্ষিক নবদিগন্ত নববর্ষ সংখ্যা ১৩৯৯) , 'হিউম্যান' (সংহতি- ১লা বৈশাখ, ১৪০১) , 'কনর্সাট' (কলাপ ১৯৯১ দি জুয়েল ক্লাব মুখপত্র) 'হালুম' (একবিংশতি বার্ষিক শিশু উৎসব ১৯৯৮- মদন মোহন বাড়ি শিশু সংস্থা স্বরণিকা), 'উপিনে র টেলি' ('কলাপ' ১৯৯২ চতুর্থ) । এর মধ্যে ' উপিনের টেলি' সাক্ষরতা বিষয়ক নাটক এবং ' ভূত দর্শন ' ও 'হালুম,' ' উদ্ভট ' রসের নাটক যা মূলত শিশুদের জন্য লিখিত। এর মধ্যে ' উপিনের টেলি 'ও ' কনর্সাট ' নাটকে কোচবিহারে স্থানীয় রাজবংশী ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই কথোপকনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমন 'আখেন বাবু, আখেন/ মোর একটা নিবেদন শোনো বাবু' । (পৃ ১ কনর্সাট) কিংবা " কি রে টুসি, কি খেলের ধরছিস ?" (পৃ-১ উপিনের টেলি)

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় সুবোধ তালুকদারের নাটকগুলি নাট্যকারের সচেতন বক্তব্যবাহী হওয়ায় এগুলিতে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত নেই বললেই চলে। বস্তুত এগুলি নাটকের মোড়কে নাট্যকারের বক্তব্যবাহী মাত্র বলাই সঙ্গত।

সুনীল সাহা

সুনীল সাহার এ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা হল দুটি। এগুলি হল 'আমি বিয়ে করব' ও গুরুদেব (ভন্ড)। দুটি নাটকের মধ্যে প্রথম হল হাস্যে রসাত্মক সাথলক ও দ্বিতীয়টি হল রঙ্গ ব্যাঙ্গ াত্মক নাটক। অর্থাৎ প্রথমটিতে দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্য নাট্যকার নির্মল হাস্য রসের অবতারনা করেছেন। দ্বিতীয়টিতে লেখকের মনোগত কোন বক্তব্য পরিস্ফুষ্ট করার জন্য বঙ্গ ও ব্যাঙ্গ্য মাধ্যমকে ব্যাবহার করেছেন।

প্রথমেই ' আমি বিয়ে করব' নাটকটির আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যায়। লক্ষীয় যে নাট্যকার এখানে নাট্যকার কুশিলব বা চরিত্র পরিচিতি প্রচলিত নিয়মানুযায়ি নাটকের প্রারম্ভে দেননি। সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোকনা কেন তা নাটকের শেষে মুদ্রিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নাটকটির মুদ্রন সৌন্দয্যর্র খানিকটা হানি হয়েছে অস্বীকার করা যায় না। পাঁচটি দৃশ্য সম্বলিত ৫৮ পৃষ্টার এই নাটকটিতে মোট চরিত্র রয়েছে আটটি, তবে মূল ঘটনা প্রবাহ গৃহকর্তা হরিনারায়ন চৌধুরী ও তারই গৃহভৃত্যর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হযেছে । গৃহকর্তার পুত্রের বিয়ের কথা শুনে গৃহভৃত্যফ্যানতার প্রবল বিবাহেচ্ছার মধ্যে দিয়ে যে সংলাপ নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন তা সমগ্র নাটকীয় ঘটনাক্রমকে করেছে প্রবল হাস্যোদ্দীপক। তাই নাটকের শেষ দৃশ্য গৃহকর্তার পুত্রের বিয়ের নিমন্ত্রন ফ্যান্তা কিভাবে করবে গৃহকর্তা জানতে চাইলে জবাবে ফ্যান্তা বলেছ। আ-আগামী কা-কা-কাল আমার বি-বিয়ে আপনাদের সকলের নি-নি-নিমন্ত্রন ন-ন-নন (হাত তুলে নমস্কার)। (পৃ -৫৮ আমি বিয়ে করব) এর মধ্যে তার নিজের বিয়ের নিমন্ত্রন করার বিভ্রম তৈরী হয়েছে যা দেখে দর্শক সাধারনের হাস্য সম্বরন করা দুঃসাধ্য। তবে হাস্যবস পরিবেশনে নাট্যকার সর্বদা ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছেন বলা যায় না, বিশেষ করে পুরোহিত চরিত্রটি অধিকতর কৌতুক কর করতে গিয়ে যেভাবে তার মুখে সর্বদা ' ওঁ সায়াহ্নে ভোজনম ' ব্যবহার করেছেন তার কোন কারন খুজেঁ পাওয়া যায়না। ফলতঃ তা কখনো কখনো একঘেয়েমির পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাছাড়া তার বন্ধু ছ্যানার চরিত্রে পূর্ব বঙ্গীয় ভাষার সংলাপের মাধ্যমে যেভাবে হাস্য রস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল তাতে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা - ভাষীদের ভাঁড় চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করার নাট্যকার-দের প্রচলিত মনোভাবের থেকে তিনি নিজেকে ব্যাতিক্রম বলে গন্য করতে পারেন নি । যেমন " আগে কঁচেন বিয়াতে কেমন ট্যাহা ঢালবি। তার আগে কতো কি কি মিষ্টি আনবি" (পৃষ্টা ৩৬ আমি বিয়ে করবো)। তা ছাড়া নাটকে পরিবেশিকত ফ্যানতার একটি গান ঃ

' আ-আ আমি যে আমাশার রুগী
তাইতো বা-বা-বাগানে হা-হাগি...."

শুনলে স্থুলো রুচির দর্শকরা যতই আমোদ অনুভব করুক না কেন শ্লীলতা ও নান্দনিকতার মানদন্ডে রুচী বিকারের লক্ষণ বলেই গন্য হবে। তবে নাটকটি সর্বসাধারনের উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

সুনীল সাহার দ্বিতীয় নাটক গুরগদেব (ভন্ড) নাট্যকের নিজের ভাষায় রঙ্গ ও ব্যাঙ্গ নাটক । ১৫ পৃষ্টার এই নাটকে নাট্যকার কোন দৃশ্য বলে কিছু উল্লেখ করেননি কিন্তু এক ও দুই অধ্যায়ের মাধ্যমে কার্য্যত দৃশ্যান্তর ঘটিয়েছেন। সমগ্র নাটকটিতে চরিত্রের সংখ্যা হল সাতটি। এ ছাড়া দুটি চরিত্র নেপথ্য থেকে ঘটনাক্রম নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন কবেছে। চরিত্র দুটি হল উদয় বাবুর স্ত্রী রমলা এবং গুরু চরন বাবুর পুত্র অসীম। সমগ্র নাটকটিতে পরশুরাম রচিত বিরিঞ্চি বাবা গল্পের ছায়াপাত লক্ষ্য না করে পারাযায়না। বিশেষ করে গুরুচরনের সাথে গুরুপদ বাবুর এবং জগা, মনীশ চরিত্রের সাথে সত্যরমত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্রের তবে পার্থক্য ও যে নেই তা নয়, বিশেষ করে হাঁদা ধর্মের নামে প্রতারনা করলে ও বিরিঞ্চিবাবার মত অপ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সবাইকে মন্ত্র মুগ্ধ করতে পারেনি। সে তার জ্যাঠামশাই যে গুরুচ রন বাবুর যথাযত গুরু জালিয়াতি গতি করে তার পরিবর্ত হিসাবে কাঞ্চনমূল্য ও তৎসঙ্গের অতিরিক্ত হিসাবে শ্রদ্ধা ভক্তি ও আদায় করেছে। তবে নাট্যকার শুধু যে ধর্মীয় প্রতারকদেরই চিহ্নিত করেছেন এমন নয়, রাজনীতির ও সামাজিক অঙ্গনে যারা গুরুস্থানীয় হয়ে বসে আছে তাদের উদ্দেশ্য ইঙ্গিত করেছেন। ফলে নাটকীয়বক্তব্য বাড়তি মাত্রা সংযোজিত হয়েছে বলা চলে। নাটকের ক্লাইমেক্স সৃষ্টির কোন চেষ্টা নাট্যকার করেননি। তবে নাটকের শেষ ভাগে যখন মনীশ বলে 'ঐ সব ভন্ড গুরুদের শায়েস্তা করার জন্য আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। পারবেন কি আমাদের সহযোগিতা করতে? আমাদের সঙ্গে একসূরে পারবেন কি ঐসব খুনী - ডাকাত অর্থ-পিশাচ গুরুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ' (পৃ-৩২-গুরুদের ভন্ড) তখন তা যতই নাট্যকারের মনোভঙ্গীকে প্রকাশ করুক না কেন

দর্শক সাধারনের কাছে একঘেয়ে ও আবেগ সর্ব্বস্ব হয়ে উঠে। সবশেষে বলা যায় আভ্যন্তরীন বক্তব্য বিচারে যতই গভীর অর্থবহন করুক না কেন নাট্য কে র প্রারম্ভে নাটকটির চরিত্র বিচারে নাট্যকার যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গাত্মক বলে শ্রেনীভুক্ত করেছেন তা সঠিক নয় বলেই বলা সংযত। কেন না শেষ পর্যন্ত গুরুচরন বাবুর পুত্র অসীমের মৃত্যর মধ্য দিয়ে নাট্যকার যে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভন্ড গুরুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেছেন তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় এই নাটকে রঙ্গরসের কোন অবকাশ নেই। কাজেই সেদিক থেকে বিচার করলে নাটকটিকে ব্যঙ্গাত্মক বা শ্লেসাত্মক অভিধায় অভিহিত করাই শ্রেয়।

তরুন দাস

তরুন দাস কোচবিহার জেলার একজন তরুন নাটক রচয়িতাই নয়, একজন তরুন অভিনেতাও বটে। তার প্রকাশিত নাটক 'সোনার মাথা ওয়ালা মানুষ' তুফানগঞ্জ দিঘলাপাড়া দুর্গোৎসব রজৎ জয়ন্তী বর্ষ স্মরণ সংখ্যা 'চিন্ময়ী' ১৯৯২ এ প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের মুখবন্ধে চিন্ময়ীর সম্পাদক তার নাট্য বৈশিষ্টের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন 'তরুন দাসের নাটকে যেমন প্রাচীনত্বের ছোঁয়া রয়েছে, তেমনি আছে বাঁক নেবার অর্থাৎ ধর্ম ভাঙ্গার প্রচেষ্টা।'[1]

সাত পৃষ্টার একাঙ্ক এই নাটকটিতে চরিত্রের সংখ্যা হল ছয়টি। এগুলি হল রাজা, মন্ত্রী, কোটাল, পেয়াদা হিসাব রক্ষক হলধরের পুত্র। তাছাড়া জনতার চরিত্রে নাম হীন কিছু ব্যাক্তিও নেপথ্য চরিত্র হলধর। নাটকের বিষয়বস্তু রাজার সোনার প্রতি লোভকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। গল্প কাহিনিতে বর্নিত রাজা মিডাসের ন্যায় আলোচ্য নাটকের রাজা সোনার প্রতিলোভের বশবার্তা হয়ে তার স্বাভাবিক যুক্তিবুদ্ধি ও কান্ডজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই যখন খাজনা বাকির দায়ে মহারাজ হলধর পুত্রকে ধরে আনার নির্দেশ দেন তখন হিসাব রক্ষক জানায় 'আজ্ঞে মহারাজ ওর যে সোনার মাথা তাই তর্ক করে পারিনি' তখন রাজা বাহ্যজান রহিত হয়ে তাকে ধরে আনার নির্দেশ দেন। হিসাব রক্ষক যদিও একবার দ্বিধা জড়িত স্বরে আজ্ঞে সোনার.....বলে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সোনার মাথা কথাটি সম্পুর্নই প্রতিকী। এটি হলধর পুত্রের প্রখর বুদ্ধিমত্তা মেধার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র তখন রাজা বুদ্ধিতে স্থিত না হয়ে লোভ রিপুর বশীভূত হয়ে কান্ডজ্ঞান রহিত হয়েছেন। আক্ষরিক অর্থে স্বর্ণমস্তকের অধিকারী ভ্রমে হলধরপুত্রকে ধরে এনেছেন এবং সোনার প্রতি অতিরিক্ত আকাঙ্খার বশবর্তী হয়ে তিনি অধস্তন কর্মচারিদের প্রতি ও বিশ্বাস হারিয়েছেন। পক্ষান্তরে রাজার সোনার প্রতি লোভ তার অধীনস্তু কর্মচারীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। বলা বাহুল্য অধীনস্তু কর্মচারীদের লোভ ও ফলত অসাবধনাতার সূয়োগ নিয়ে হলধর পুত্র রাজসভা ত্যাগ করে। তবে রাজসভায় অবস্থানকালীন লোভি রাজার পরিনতি সর্ম্পকে সে কৌশলে ইঙ্গিত দেয় । যখন রাজা বলেন 'বলতোসোনা মানিক ত্রেমার মত আর কেউ সোনার মাথা ওয়ালা আমার রাজ্যে আছে নাকি? এবং প্রত্যুওরে কথা প্রসঙ্গে হলধরপুত্র জানায় 'এত মাথা একসঙ্গে আপনার প্রাসাদে আটবেনা , হাজার হাজার সোনার মাথা গুড়িয়ে চুড়মার করে দেবে আপনার এই প্রসাদ। তাদের জন্য লোক পাঠাতে হবেনা, ওরা নিজেরাই এসে হাজির হবে,' তখন রাজার ভবিতব্য যেন দেয়ালে লিখিত হয়ে যায়। যদিও মূর্খ নিজে তা পাঠে অক্ষম। তবে নাটকের শেষাংশে রাজার উক্তি 'এত সোনার মাথা। প্রসাদে আটবেনা সদর রাজা বন্ধ করে দাও' র মধ্যে হলধরের পূর্বের উক্তিরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। সবশেষে রাজার,' সর্বনাশ আমি আর রাজা থাকতে চাইনা 'র মধ্যে রাজশাসকের চূড়ান্ত পতনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুত নাটকটির মূল বক্তব্য সর্বদেশের সর্বকালের নির্বোধ ও অত্যাচারী শাসকের প্রতি তর্জনী উত্তোলন বলা অসঙ্গত নয়। কিন্তু নাটকের কিছু কিছু ইংরাজী অথবা অন্য কোন বিদেশি শব্দের প্রযোগ যেমন- টোটাল, কেজি,হাফ, নিলডাউন, আইডিয়া, প্রেসার, লেট, ইঞ্চি, হাফিস ইত্যাদি নাটেকের ভাষার গাম্ভির্জ্য খর্ব করেছে বলা যায়।এই শব্দগুলির বিকল্প বাংলা শব্দ গুলি বহু প্রচলিত। তাই অনায়াসে এগুলিনাটক ব্যাবহার করা এড়ানো যেত। তবে প্রশাসন ও আমলা তন্ত্র সবাই কোন ধরনের পরিবর্তন কে এড়িয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চিরকালের পদ্ধতি অনুসৃতিতে মন্ত্রীর উক্তি 'আমি বলিকি মহারাজ যেমনটি চলছে তেমনটি চলুক' এ প্রতিপন্ন হয়। তবে সবশেষে 'সবাই কোথায় যাই কিকরি কোথায় পালাই 'এমন অবস্থাতে এলোপাথারি ছুটোছুটি করতে থাকে তখন নাটকারের এই উক্তির মাধ্যমে নাটকের যবনিকাপাত কে আকস্মিক বলেই মনে হয়। যাই হোক নাটকটিকে নাট্যকার তরুন দাসের পরিনতি নয় প্রতিশ্রুতি বললে অনৃত ভাষণ হয়না।

জীবনকৃষ্ণ দে

জীবনকৃষ্ণ দের প্রকাশিত নাটক 'পাবলিসিটি'সাকুল্যে ২১ পাতার অথাৎ এক ফর্মার কিছু বেশী যাতে মুখ্য চরিত্র রয়েছে উনিশ-টি, এছাড়া রয়েছে অন্যান্য চরিত্র। এই নাটকে দৃশ্য সংখ্যা হল পাঁচটি।নাটকের বৈশিষ্ট্য হল ভদ্রেতর চরিত্র গুলির অধিকাংশের সংলাপ রাজবংশী উপভাষায়। একটি চরিত্রের মুখে সংলাপ বসানো হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষায় যাএতদঞ্চলে স্বাধীনতার পর উভয় বঙ্গের জনস্রোতের -গঙ্গা- যমুনা মিলনের চিত্রকেই প্রতিবিম্বিত করে। যেমন চাঁদমিঞা 'তাক এ ভাল কিন্তুক মোক পাছে পাঠানো তোমার ওই হারগিলাটার ওটে। বাপ এগলালোক কটে থাকি আইনচেন একটু পটাননা কাটুয়া শুইলং হয় খানিক' অথবা মনোহরের কথা 'ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম- হোটেল গুলিক নাহি এমন হাজানই হাজাইছে খালিদেহনের বাহার। কিন্তু মাগনা খাইর কোন হুমন্দির পুতে। মাগনা! হাতদিন না খাইলেও না!'

নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের কথাগুলির চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যা অভাবনীয়। যেমন- মিঃ গুপ্ত ও মিঃ মুখার্জির মত সরকারী কর্মচারী যাদের কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলে তাদের মধ্যে একদিকে লক্ষ্য করা যায় গ্রামীন জনগনের প্রতি তীব্রতা-চ্ছিল্য অপর দিকে গ্রাম ও গ্রামীন মানুষের জীবনযাপন সর্ম্পকে অসীম অজ্ঞতা। নীচের সংলাপে তা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে।

মিঃ গুপ্ত..... আচ্ছা মুখার্জি লোকগুলো এমন হাফ নেকেড কেন বলতে পার? সত্যিকি ওদের কোন জামা কাপড় নেই, না একদমজঙ্গলি- স্রেফ। মুখার্জি দি আইডিয়া! ওরাপড়বে জামাকাপড় স্যার, তবে আর টাকাহাড়ি মটিতে পুতবে কেন? ঐ যে বলেছেন.... স্রেফগিয়ে বলতে হয় অসভ্য ওরাকেবল টাকাই চেনে,' অথবা 'এই হাটেই ধরুননা কেন সোয়াসের চা-উলের একসের বিক্রি হলে বাকিটা ঐ সঙ্গেই ধরে দিত। পৃথক কোন দাম নিতনা পর্য্যন্ত, কিন্তু যাবেন তোআজকাল। ঝিওয়াছা ওয়া হলেতো কথাই নাই ফাও চেয়েছেন কি তেড়ে মারতে আসবে।' (পৃ-৬) ঐ মন্তব্যই প্রমান করে এই কর্মচারী শ্রেনী যেমন অজ্ঞ তেমনি সুবিধাবাদীও বটে। তাই গ্রামীন মানুষের নিদ্রাভঙ্গ এই সুবিধাবাদী কর্মচারীদের বিরক্তির কারন।

নাটকীয় ঘটনা ক্রমে দেখাযায় সরকার থেকে সমবেতভাবে নেওয়া গ্রুপ লোন বা গুচ্ছ ঋণ মুকুবের জন্য সরকারী অফি-সে সমবেতগ্রাম্য জনগনের উমেদারী অনাদির অনড় নেতৃত্বে প্রবল প্রতিবাদধ্বনিতে রূপান্ত রিত হয়। যখন মিঃ গুপ্ত ঋণ মুকু বে অক্ষমতার কারন হিসাবে সরকারী টাকার অপ্রতুলতার কারন দর্শান তখন গহিমের সরল জিজ্ঞাসা সরকারের টাকা যদিনাই থা কবে তবে ঐ টাটা কোম্পানির ১০ কোটি টাকা বিনা সুদে ধারদিতে কেমন করি? তায় তুমি আমার চায়াও গরীব"
(পৃ-১৪- পাবলিসিটি) কেলকোলী বর্মনের স্ত্রী অনাহারে মৃত্যু সরকারী ব্যর্থতাকে প্রতিপন্ন করবে এই আশায় তা সরকারী প্রেস নোট ও বেসরকারী প্রচার মাধ্যমের পাবলিসিটি বা প্রচার মাহাত্ম্য রূপান্তরিত হয় জ্বর ও আমাশয়ে মৃত্যুর সংবাদ হিসাবে। ফলে নিরন্ন মানুষের অন্নের অধিকারের স্বিকৃতিত মেলেইনা এমনকি মেলেনা তারা যে নিরন্ন অনাহারী এই স্বাভাবিক স্বিকৃতিটুকুও। তবে নাটকে অনাদি চরিত্র যেমন প্রতিবাদী তেমনি স্পট উক্তির জন্য গহিম চরিত্রটিও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষন না করে পারেনা। সেই সময়ে প্রচলিত ভারতের অনান্য দেশীয় রাজাদের ন্যায় কোচবিহারের মহারাজার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদত্ত ভাতা ও অনান্য সুবিধা সর্ম্পকে গহিমের মন্তব্য.. এইত ধরেন মহারাজা হইল গিয়ে একটা মানষি তাক দিছে ১৪ হাজার বিঘাজমি। সাড়ে আট লাখ টাকা ভাতা ।'
(পৃ-১১ পাবলিসিটি) মহারাজা সর্ম্পকে প্রচলিত রাজভক্তির ধারনার বিপরীত ধারনাই গড়ে তোলে। স্পষ্ট হয় গ্রামীন মানুষ অতি ধীরগতিতে হলেও সামন্ততান্ত্রিক মোহকে ছাড়িয়ে গনতান্ত্রিক মানসিকতায় প্রবেশ করেছে। অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার খাঁপুরের তেভাগা কৃষক আন্দোলনের অমর সৈনিক চিয়ার সাঁই শেখ স্মরনে উৎসর্গ কৃত এই নাটকটি যেমন নাট্যকারের অবহেলিত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি তার অবিমিশ্র দরদকে প্রকাশ করেছে তেমনি প্রতিটি চরিত্র ও তাদের সংলাপ মাটি থেকে উঠে আসা বলে সহজ ও স্বাভাবিক বিশেষ করে রাজবংশী উপভাষা প্রয়োগ এই স্বাভাবিক তাকে আরো স্পষ্ট করেছে এটি যেমন সত্য তেমনি অন্যদিকে এটি আবার নাটকের অন্যতম ত্রুটি ও। কেন না কোচবিহার ও সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলা অর্থাৎ যেখানে রাজবংশি ভাষা গোষ্ঠির লোকের বসবাস

সেই সীমার বাইরে বোধগম্যতার অভাবেই নাটকের ব্যাপ্তি লাভ করার সম্ভবনা কম। যাইহোক সামগ্রিক ভাবে নাটকটি পঞ্চাশ থেকে ষাট দশক পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিয় জেলা কোচবিহারের সমাজচিত্রের একটি দর্শন বলা অন্যায় নয়। তবে এই নিরাশার মাঝে পুলিশ কনষ্টেবল চৌবের কথায় যেন অল্প হলেও মনুষ্যত্বের স্পর্শ পাওয়া যায়। যেমন 'এই পেলদু চলিয়া যা - দেখ জাহাজী হামরা দেশ মেভি বহুত বানহুয়া ইয়ে বরিস পাবলিক লোক এয়ছা নাংগাফুক আছে দুনা মুলুকমে। আভিযব কাটিহার যায়গা তব দেখনা পড়েগা দেশ ছোড়কে হাজার হাজার দেহাতি লোক বংগাল মুলুকমে আরহা। ইয়ে ধরতি মাই আদমি লোগকে পাছ বহুৎ গোস্সাকি য়া। এইসা হালত ম্যায় কভি নেহি দেখা।' (পৃ-১৭ পাবলিসিটি) বলা বাহুল্য প্রায় অশিক্ষিত সামান্য এক কনষ্টেবলের সংলাপে যে মানবিক অনুভূতির স্পর্শ পাওয়া যায় তাযেন মিঃ গুপ্ত ও মিঃ মুখার্জি কে অনায়াসে লজ্জা দেয়।

অরুনেশ ঘোষ

অরুনেশ ঘোষের প্রকাশিত একমাত্র নাটক ' বর্বরের তীর্থযাত্রা চল্লিশপাতা বা আড়াই ফর্মার নাটক। নাটকটির একাঙ্ক নয় দুটি অঙ্কের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে মোট ছটি দৃশ্যর সমন্বয়ে নাটকটির অভিনেতা অভিনেত্রির সংখ্যা হল বারটি।

আলোচ্য নাটকের দুটি অঙ্কের প্রত্যেকটিতে অনায়াসে প্রধান চরিত্র রঘুনাথের কথনের মধ্যে দিয়ে নাট্যদৃশ্য বর্নিত হয়েছে। বিপথগামী প্রতিভা রঘুনাথ যাকে তরুনী রীনা খুঁজে বের করেছে প্রবল আগ্রহে, অসম বয়সী দুটি নরনারীর মধ্যে বর্নিত হয়েছে ইডিপাস কমপ্লেক্স অর্থাৎ মাতা পুত্রের দৈহিকসম্পর্ক ও তার পরিনামের দিকটি। গ্রীক কাহিনীকার সফোক্লিস রচিত ইডিপাসরেক্সে জোকাসটা ও তার পুত্র অয়দিপাউস পরস্পরের পরিচয় না জেনে স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল, শুধু তাই নয় সন্তানের জন্মদিয়েছিল, শেষ পযন্ত আত্মহত্যায় যার জীবনের জ্বালা জুড়ায়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে লক্ষ্য করা যায় আর্বজনার স্তুপের পাশে স্ত্রীলোককে যার আত্মকথনের মধ্য দিয়ে দর্শক শোনে কেমন করে স্বামীহীনা নারী প্রবৃত্তি তারিত হয়ে আপন পুত্রের সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে হয়েছে সন্তান সম্ভবা। বলা বাহুল্য নাটকের ঐ গর্ভবতি নারীর উন্মত্ত সংলাপ। 'ওহ মাথা টা ফেটে যাচ্ছে।মাথা !মাথা! মাথা! কেউ আমার চুলের মুঠি ধরে একটা আছাড় দাও । মারো মারো আমাকে একে বারে মেরে ফেলো" (পৃ-৭), অথবা ' উঃ কীপাপ আমি করেছি ' যেন আত্মকথন নয় আত্মহননেরই নামান্তর হয়ে উঠে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য দেখা যায় সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা ও মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে জর্জরিত গৃহবধু পুত্রের বন্ধুর সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়। নাট্যকারের নিজের ভাষায়' দক্ষিন বাহুতে জড়িয়ে ধরে পুত্রসম পুত্রের বন্ধুর গলা -অ াহা-হা- (কপালে ও মুখে চুম্বন করে) কি কষ্ট! কি কষ্ট! আর তার বাম হাতটা ঢুকে যায় শ্যামলের পাজামার মধ্যে)' (পৃ-২৪) বলা বাহুল্য মাত্র এযেন ইডিপাস কমপ্লেক্সেরই নব রূপান্তর। কিন্তু এই আত্মঘাতী সর্বনাসা যৌন সম্পর্ক যা হয়তবা আত্ম বিস্মৃতিরিই ফল তা যে মুখ্য হতে পারেনা তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় রঘুনাথের উদ্দেশ্য রীনার এই বক্তব্যে ' এর নীতি কথাটি হল, নেশা করোনা নেশা করলে মা ছেলেকে চিনতে পারবেনা' এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সাথে সংগম সহবাসে জড়িয়ে পড়বে তারপর যখন নেশা কেটে যাবে, স্মৃতি ফিরে আসবে, পরস্পরকে চিনতে পারবে ততদিনে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে'- তাই তো (পৃ-১৬) সফোক্লিসের অয়দিপাউস নাটকের জোকস্তার পরিনতি ছিল মৃত্যু । কিন্তু এই নাটকের স্ত্রীলোক ও স্বর্নলতার মুক্তি হয় যথাক্রমে একটি বয়স্ক ও সতীনাথের হাত ধরে তীর্থযাত্রার মাধ্যমে অর্থাৎ অপূর্নতার সীমা ছাড়িয়ে পূর্নতার লক্ষ্যে, এমন কি তীর্থ যাত্রী হয়েছে রঘুনাথ ও রীনাও।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভুষন মজুমদারের এ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা হল পাঁচটি। নাটকগুলি গ্রন্থাকারে কোথাও প্রকাশিত না হলেও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকগুলি হল' দিগড অন মাউন্ট সিনাই (মন্দিরা)' রাঙাদি(উত্তরায়ন)'মহাসত্ত' (চতুরঙ্গ) , বিয়োগ (উত্তরায়ন) মধুরার ফ্ল্যাট ও মিউজিয়াম (পাক্ষিক ত্রিবৃত্ত)

উল্লিখিত নাটকগুলির মধ্যে 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই', 'মহাসত্ত' বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই' ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাটকের বিষয় বস্তু হল মিশরের ফ্যারাওয়ের রাজত্বে আপাত সুখে থাকা ইজরায়েলীরা লোহিত সাগর পেরিয়ে তাদের হারিয়ে যাওয়া মাতৃভূমির খোঁজে যাত্রা শুরু করে ছিল স্বাধীনতা ও আত্মপরিচিতির সন্ধানে মোজেসের পথ প্রদর্শনায়। চিরদিনের চেনা স্থান ছেড়ে মরুভুমির কাছে এসে দেখা গেল বাস্তুহারা ইহুদি বা ইজরায়েলীদের নিরালম্ব অসহায়তা। তাই যে নাদাব প্রতিটি ইজরায়েলীদের কাছে বীর শ্রেষ্ঠ বলে গন্য হতেন ইথিওপিয়া বিজয়ী বলে তার মনের মধ্যে বিরাজ করে এক ধরনের ভয়, অসহায়তা। তাই নাদাব আ- রনকে বলে 'তোমরা সন্ধ্যে না হতেই অমন করে তাঁবুর আলো নিভিয়ে দাও কেন ? ..... সত্যি, একটু ভয় হয়, আলোটা জ্বালিয়ে রেখো' (পৃ- ৮২দি গড অন-মাউন্ট সিনাই) আবার মোজেসের মনে দুর্বলতার সুযোগে বহু বীর ইজরায়েলীকে নিয়ে ভুল পদক্ষেপ গ্রহন করে রূপবতী জুডিথ। একদা ত্রাতা, বীর বলে গন্য মোজেস, আ- রন, নাদাবকে অন্তহীন পথ চলার হতাশায় তারা ঘেরাও করে। হতাশ ইজরায়েলীদের প্রতিনিধি হিসাবে ফেইনকে বলতে শোনা যায় " তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা ফ্যারাও'র রাজ্য ছেড়ে এসেছি। তোমাদের কথায়, প্ররোচনায় আমরা নীলনদের সাথে শত্রুতা করেছি। আর আজ আমাদের পায়ের নীচে সর্বনাশ, সবশুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সর্বনাশে যেতে হলে তোমাদেরই আগে যেতে হবে, কি বলো, সেই তো নিয়ম ?" (পৃ-১০৭ - 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই')

আবার দীর্ঘযাত্রা শেষ করার পর যখন অনিকেত ইজরায়েলীরা সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে এসে আপন বাসভুমি খুঁজে পায় তখন বাস্তুহীন মানুষের পথচলার ক্লান্তি লাভ করে অনুপম সার্থকতা। তাই সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় নতজানু হয়ে অনির্দেশ্য শক্তিকে অভিবাদনরত মোজেসের চিত্র নাট্যকারের ভাষায় বর্নিত হয়েছে "চারিদিকে আবার বজ্রপাতের শব্দ। আবার সিনাই পাহাড়ের চূড়া বিদ্যুতে ভরে তীব্র আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আলোকে দেখা গেল একটি মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মূর্তিটি ধীরে ধীরে জানু পেতে বসে উর্দ্ধে দু বাহু উৎক্ষিপ্ত করছিল যেন কাকে হৃদয় ভরে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে তার ভাব ভাষা খুঁজে পাচ্ছেনা। (পৃ-১১০ ঃ 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই')

১৩৬০ বঙ্গাব্দে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত নাট্যকার শ্রী অমিয় ভুষনের নাটক ' মহাসত্ব ' ৩১ পৃষ্ঠার এমন একটি নাটক যার পটভুমি হলো বাংলার সেন বংশের রাজা লক্ষন সেনের রাজত্বের শেষদিকের তুর্কী আক্রমন, লক্ষন সেনের সভাসদ, মহাসত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিকা ইত্যাদি। তবে এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় মতবাদ সর্ম্পকে লেখকের নিজের বিদ্রুপাত্মক ভাবনাও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ,

' প্রথম যাত্রী ' ঃ আজকালের আদেশ শোননি ? জাত ধম্মের কথা তুলে বৌদ্ধদের মনে কষ্ট দেওয়া আরচলবে না। আমাদের রাজা ধম্ম পতিপক্ষ।

' দ্বিতীয় যাত্রী ঃ ধম্ম পতিপক্ষ নয়, কথাটা নিরপেক্ষ। (পৃ-৪০ ঃ' মহাসত্ব ')

এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে বুঝতে অসুবিধা হয়না। কেননা মধ্যযুগে ধর্ম নিরপেক্ষতা শব্দটি জনসমাজে কতটা প্রচলিত ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

নাট্যকারের অপর দুটি নাটক 'রাঙ্গা দি' ও 'বিয়োগ' এর প্রথমটির বিষয় বস্তু হল - ক্যানসারে রোগাক্রান্ত পিতা এবং তার পুত্র,পুত্র বধূর পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাত এবং 'রাঙ্গা দি ' নাটকে- কোন এক আরোগ্য নিবাসেরঅধি-

বাসীদের মাঝে রাঙ্গা দির ভুমিকাইমূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। নাটক দুটিতে নাটকীয় সংঘাত তেমন না থাকায় এগুলি পৃথক ভাবে বিশেষ আলোচনার দাবী রাখেনা।

সবশেষে বলতে হয় নাট্যকার শ্রী অমিয় ভুষন পাঁচটি নাটক রচনা করলেও নাটকীয় উৎকর্ষ বিচারে 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই' যতটা উল্লেখ যোগ্য বাকী নাটকগুলি অবশ্যই সেই দাবী করতে পারেনা।

নারায়ন চন্দ্র বর্মন

১৯৯৪ সালে নারায়ন চন্দ্র বর্মন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন তার নাটক 'সোনাবৌদি' এবং 'লণ্ঠন'। প্রথম নাটকটি পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত এবং দ্বিতীয় নাটকটি স্ত্রী ভূমিকা বর্জ্জিত। প্রথম নাটকটি তেইশ পৃষ্ঠার এবং দ্বিতীয় নাটকটি দশপৃষ্ঠার।যথাক্রমে পাঁচটিও দুটি দৃশ্য সমন্বিত এই নাটক দুটির মধ্যে মিল হল দুটি নাটকই স্বাক্ষরতা প্রসার কেন্দ্রীক এবং উত্তরবঙ্গের কথ্য আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে লিখিত। প্রচারধর্মী নাটক দুটি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা নিস্প্রয়োজন।

অলোক গঙ্গোপাধ্যায়

অলোক গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন তার নাটক 'তিনটি নারীঃ আদালত এবং আমি'নামে। একটি হলেও আসলে এটি দুটি নাট্যগ্রন্থের সমন্বয়।

প্রথম নাটক 'তিনটি নারীঃ আদালত এবং আমি' আটত্রিশ পাতার এমন একটি নাটক যাতে চরিত্রের সংখ্যা হল সাতটি। তার মধ্যে প্রধান তরা যাদের নারীজনোচিত কামনা বাসনা অতৃপ্ত থেকে গেছে। এইগুলি হল বঙ্কিম চন্দ্র চটোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ কান্তের উইলের 'রোহীনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবির' 'বিনোদিনি' এবং শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের চরিত্রহীনের কিরণময়ি চরিত্র। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপগুলি এইরকম 'উকিল-' সুতরাং বিনোদিনি একজন আধু-নিকা- কুসং-স্কারে আচ্ছন্ন তথাকথিত প্রাচীন প স্থিবিধবানন., অথচ শেষপর্যন্ত তার পরিনতি প্রাচীন সংস্কারের পথেই হয়েছে। তবে কি চরিত্রটির উপর অবিচার করা হয়নি, ধর্মবতার? (পৃ-২৩)

নাট্যকারের দ্বিতীয় নাটক 'কল্পিত সংলাপ' ২৩ পৃষ্টার এমন একটি গ্রন্থ যাতে মাইকেল মধুসুধন , বিদ্যাসাগর , রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি চরিত্রের মুখে কল্পিত সংলাপ বসিয়ে করুন রসাত্বক গ্রন্থ রচনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মহৎ কবিদের মহৎ কাব্যর প্যারডি বা ব্যাঙ্গ রচনা করা হয়েছে। যেমন মেঘনাদবধের প্রমিলার উক্তির

'কি কহিলি, বাসন্তি? পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্য,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধেতার গতি' এবং প্যারডি
'কি কহিলি কাসুন্দি? পিতৃ গৃহত্যাজি
কন্যা যবে বোম্বে যায় হিরোইন হতে
কার হেন সাধ্য আছে রোধে তার গতি?' (পৃ-৪৭- তিনটি নারী আদালত এবং আমি)

বস্তুত নাটক দুটিতে নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত, দৃশ্য বা দৃশ্যান্তর রচনা, বাস্তবধ র্মী সংলাপ কোনকিছুই নাথাকায় এ দের নাটকীয়তা নেই বললেই চলে। বরং বলা যায় গ্রন্থের নাটকদুটি নাটকীয় অবয়বে নাট্যকারের সচেতন বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে মাত্র।

হরিশ চন্দ্র পাল

১৩৮৪ বঙ্গাব্দে হরিশ চন্দ্র পাল প্রকাশ করেছেন দুটি নাটক সম্বলিত ছিয়ানব্বই পৃষ্টার নাট্যগ্রন্থ 'একরাত্রির ঘটনা'ও ব্ল্যাক মারকেট'। দুটি নাটকিই ৪৮ পৃষ্টাসম্বলিত।

প্রথম নাটক' এক রাত্রির ঘটনা দেখা যায় ডাকাতের হাতে নিগৃহিতা পারু নিজগৃহে স্থান নাপেয়ে নার্সিং হোমে আশ্রয় পাবার পর ধীরে ধীরে নার্সিং হোমের ডাক্তারের প্রতি একধরনের আসক্তি দেখাদেয় যাকে দেহাতীত প্রেমবলা সংগত। কিন্তু আদর্শবোধ ও জীবনতৃষ্ণা দুয়ের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ডাক্তারের জীবন অনিবার্য পরিনতির দিকে এগিয়েছে এবং সবশেষে ডাক্তার রায়কে আত্মহনের পথ বেছে নিতে হয়েছে। জীবনের অন্তিম মহুর্তে ডাক্তার উপলব্ধি করেছেন যে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনা করেছেন। তবে নাটকে আবেগ বাহুল্য নাটকের স্বাভাবিক গতিকে বিড়ম্বিত করেছে বলা যায়। যেমন 'ডাঃ রায়। কে পারু? পারু কেন তুমি আমাকে শাস্তি দিলে? কেন আমার এশান্ত জীবনকে অশান্ত করে তুললে? কেন ক্ষুধাকে চেপে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছিলে? তোমার এ ভুলের ফসল..... ভূলের শাস্তি আমাকে বইতে হবে... তা কি তুমি বোঝনি?

পারু আপনাকে একা বইতে হবে কেন? ভুলের জ্বালাকি আমার মনকে পীড়া দেয়নি? আমি নারী.... আমার স্বভাব লজ্জা আমাকে বাধা দিয়েছে । কিন্তু.....' (পৃ-১৭-একরাত্রির ঘটনা)

বলা বাহুল্য আবেগ বাহুল্য বা অতিকথন যে নাটকিয় ঘটনাক্রমকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাই নয়, নাটকীয় গতিকেও করে বিড়ম্বিত। গ্রন্থের দ্বিতীয় নাটক ব্ল্যাক মারকেট স্বাধীনতা পরবর্তি ভারতবর্ষের চোরাকারবারিদের স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতিকে অনেকটাই তুলেধরেছে। যদিও নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক তবুমঞ্চসজ্জার বর্ণনা ও সংলাপ বিচারে সার্থকতা অর্জন করেছে বলা যায়। যেমন 'সাপ্লাই অফিস। এক পাশেবড়সাহেবের টেবিলে ফাইল ও কাগজের পাহাড় এবং (এম নসময়ে জনৈক ব্যাক্তির প্রবেশ। শব্দ শুনেই ব্যস্ত ভাবে কাজে মনোনিবেশ) (পৃ-১-ব্ল্যাক মারকেট)

অথবা

'হালদার-(মাথা না তুলেই) হবেনা হবেনা Special Permit দেয়া একদম বন্ধ, যান চলে যান।

১ম ব্যাক্তি- হুজুর একটু শুনুন।

মোবারক-(মাথা না তুললেই) কি? হুজুর কি তোমার চাকর যে শুনবেন?

কথা বললে কানে যায়না? কাজের সময় যত্তসব'

(পৃ-১- ব্ল্যাক মারকেট)

তবে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত হওয়ায় এর বিষয় বস্তুর আবেদন স্থান কাল সাপেক্ষ, চিরকালীন নয়। বলা যায়হরিশ পালের দূটি নাটকের কোনটিই পাঠকচিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়না।

৩৫১৪

ভবেশ অধিকারী

১৩৯৫ বঙ্গাব্দে ভবেশ অধিকারী দুটি খন্ডে' একের মধ্যে পাঁচ নামে নাট্যসংকলন প্রকাশ করেছেন। এর মধেয প্রথম খন্ডে 'এই যুগঃ কিছুমুখ' 'পিছিয়ে আধার' 'তৃতীয় পুরুষ' এই তিনটিও দ্বিতীয় খন্ডে 'আলো আমার আলো' স্বপ্ন ঃআশাহীন এই নাটক সংকলিত হয়েছে। নাটকগুলিতে সংলাপ চরিত্রানুগ হয়েছে বলা যায়। যেমন

২য় ব্যাক্তি- শোন একটা পান আনিস। তোর মাথায় ঘিলু বলতে কিছুনেই। মনে করে আনিস, ভুল হলে কিন্তু প্যাঁদানি খাবি।

তয় ব্যাক্তি-ওটা সেরে চারটা নাইট শো এর টিকিট কেটে আনবি বুঝলি ? কি যে একটা লোক রেখেছেনা ? (পৃ-৯- পিছিয়ে আধার) তবে ছোট ছেলে ইন্দ্রযখন বলে আমার নাম মানস মজুমদার, চটকলে চাকরীকরি(হঠাৎ চিৎকার করে) কেদার কেদার কোথায় গেল' (পৃ-১৫-পিছিয়ে আঁধার) এবং তখন ইন্দ্র যে জাতিস্মর এই সত্য স্পষ্টহয়ে উঠে এবং ইন্দ্রের জাতিস্মরত্ব স্পষ্ট করার জন্য ফ্লাসব্যাকে কেদারের চোখে উলুবেরিয়ার মানস মজুমদার ও তার স্ত্রী কেয়ার দাম্পত্য জীবনের ছবি বর্ণিত হয়েছে। (পৃ-৯ পিছিয়ে আঁধার) ইন্দ্রের কণ্ঠে মানসের মত কবিতা পাঠ শোনা গিয়েছে (পৃ- ১৮) এবং শেষ দৃশ্য ইন্দ্রের জাতিস্মরত্ব দ্বারাই কেয়া যে তার স্বামী মানসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল তা (পৃ -২২-পিছিয়ে আঁধার) প্রমানিত হবে। যদিও নাটকের বিষয়বস্তু ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে তাই নাটকটি লোকের মনো রঞ্জনে সক্ষম হলেও দর্শকের মনে এক অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির জন্ম দেবে বলাযায়।

আবার কখনো কখনো দেখা যায় নাট্যকারকে সচেতনভাবে বক্তব্য পেশ করতে। যেমন' বিপ্লব– এটা বুঝতে পারছিস না কেন, আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের মনে ফ্রাসট্রেশন এনে দিয়েছে।' (পৃ-১১-এই যুগঃ কিছু মুখ) বলা প্রয়োজন এই ধরনের সচেতন বক্তব্য চরিত্রের মুখে আরোপিত বলে মনে হওয়ায় তা নাটকের সাথে দর্শকের আত্মস্থ হওয়ায় পতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নাট্যকারের 'আলো আমার আলো' নাটকটি দক্ষিন বঙ্গের বিশেষ করে বীরভূমের কথ্য ভাষায় রচিত । যেমন

পাঁচু– তুই উঁয়ারে চিনিস।

রাধা – চিনবোনি। আমার ঘর আর দুর্গাদিদির ঘর গ্রেমে পাশাপাশি ছিল।(পৃ-৬- আলো আমার আলো) নাট্য কারের বাকী নাটক গুলি বিষয় বস্তু, নাটকীয় দৃশ্য, সংলাপ কোন বিচারেই বৈশিষ্ট্যর দাবী করতে পারেনা। এই প্রসঙ্গে বলা যায় তার নাটকে বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষা স্থানপেয়েছে, কিন্তু তিনি কোচবিহারের বাসিন্দা হওয়া সত্বেও তার নাটকে উত্তর বাংলার স্থানীয় উপভাষাগুলি বা অন্য কোন স্থানিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

সুধাংশু শেখর আদিত্য

পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কোচবিহার জেলার মুখপত্র' জীবন ও সংস্কৃতি'র ১৯৮৮ সালে মুদ্রিত ১ বর্ষ১ম সংখ্যায় সুধাংশু শেখর আদিত্যর একটি ২৩ পৃষ্টাসম্বলিত নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯৭৭ সালে পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রন্টসরকার কায়েমহওয়া ও১ম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর গ্রামীন ক্ষমতার কেন্দ্রের ''ারসাম্য '' লটে জোত দারেরের ক্ষমতা পালটে ভাগ চাষীরা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসা , কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষদের এই অধিকার লাভ কায়েমি স্বার্থভোগীদের কিভাবে আতংকিত করে তোলে পুলিশও জোতদার মিলে গড়ে তোলে দৃষ্টচক্র, সবশেষে সব ষড়যন্ত্র ব্যার্থ করে মেহনতি মানুষের শক্তি জয়ী হয় তা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। নাটকের শুরুতে নটহরির গানে ধ্বনিত হয়েছে ভাগচাষীদের উল্লাস ঃ

' বছির উদ্দিন প্রফুল্ল রায়ের ভাগ চাষি ছিল
তারই কাছে রায় বাবু ভোটে হেরে গেলো।
ছিঃ ছিঃ! ভোটে হেরে গেলো.....। (পৃ-৭৬-শহীদের ডাক)

আবার 'প্রফুল্লঃ এ আমি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি রাধাচরন। দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে পঞ্চায়েতী করলাম অথচ..... রাধাঃ আপনি তো দীর্ঘ আঠারো বছর পঞ্চায়েতী করেছেন আর ওরা কদিন পারে সেটাই আগে দেখুন।'(পৃ-৭৭শহীদের ডাক) তবে ৮৭নং পৃষ্টায় যখন কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি এসে বলে (আমি ইতিহাস, আমি সভ্যতার কলঙ্ক , আমি ইতিহাস, আমি ভারতের জরুরী অবস্থা , আমি ইতিহাস' (মঞ্চঅন্ধকার হয়)।

(মঞ্চ পূর্ববৎ, আলো স্বাভাবিক, পূর্ব চরিত্র গুলি এসে দাড়াঁয়) তখন তা আবেগদীপ্ত মনে হলেও নাটকের প্রযোজনের সাথে খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু এর পর যখন বিপ্লবের কণ্ঠে দীর্ঘ কবিতা শোনা যায়

'শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়
জবাব কি দিবি তার।' (পৃ-৮৭- শহীদের ডাক) তখন তা যেন অতি নাটকীয় বলেই মনেহয়। যাই হোক সুধাংশু শেখর আদিত্যর নাটকে মাটির মানুষের হাসি কান্না আশা আকাঙ্কা প্রতিফলিত হলেও তা এক বিশেষ সময় কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। চিরকালীন সমস্যা বেদনা এখানে চিত্রিত হয়নি বলে নাটকটি কে সমকালীন বলা যায় চিরকালীন নয়।

কল্যানময় দাস

১৯৯৮ সালে কল্যানময় দাস প্রকাশ করেছেন ৪৮ পৃষ্টা বা তিন ফর্মার নাটক 'ভাল্লাগেনা'। সমগ্র নাটকে দেখা যায় বিভিন্ন বস্তুর প্রতি বিতস্পৃহা বা ভাল না লাগা যা চরিত্র গুলির মুখে 'ভাল্লাগেনা' এই শব্দ প্রয়োগে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ছায়ার মুখে শোনা যায় 'গুষ্টির পিন্ডি বানাতে বানাতে আমার আর ভাল্লাগেনা' (পৃ-৩- ভাল্লাগেনা) অথবা স্বরনের কথা 'ছায়া তুমি এরকম কথা বল্লে আমারও কিন্তু ভাল্লাগেনা বলেদিচ্ছি। (পৃ-৩-ভাল্লাগেনা) কিংবা স্বরনের' আমার আর বেকার বসে থাকতে ভাল্লাগেনা ভাল্লাগেনা'। (পৃ-৩-ভাল্লাগেনা) নাট্যকার দেখিয়েছেন কি করে এককালে আদর্শের আপ্তবাক্য আউড়ে অনেকের জীবনের চলার পথ বদলে যায়। অর্থ হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র কাম্য।তাই রেশমি যখন বলে' কলেজ জীবনের তোমার বক্তৃতার সাথে তোমার এখনকার জীবনের কোন মিল খুজেঁ পাচ্ছিনা আমি' (পৃ- ৫-ভাল্লাগেনা) এবং অনির্বানের উত্তর' বক্তৃতা দিয়ে কিহয়েছে ? চাকরিটাপেতে আমার বাবাকে কত টাকা ঢালতে হয়েছে তা নিশ্চই তোমার মনে আছে' ? নাট্যকারের বক্তব্যর মূর্ত প্রমান।

নাটকের শেষাংশে দেখা যায় ভালনা লাগার ভাবকে ছাড়িয়ে উঠেছে ভাললাগার স্বপ্ন। তাই স্মরণকে বলতে শোনা যায় স্বপ্ন ভাল্লাগে ভাল্লাগে আমার স্বপ্ন ভাল্লাগে ছায়া ভানুমতি তুমিপারো ফিরিয়ে দিতে দিতে পারো ফিরিয়ে স্বপ্নের দিন ? (পৃ-৪৭-ভাল্লাগেনা)

যদিও ডাক্তারের মুখে শোনা দিয়েছে 'স্বপ্নের দিন কখনো আসেনা অনেকটা ফিনিস পাখির মত পৃথিবীর মাটিতে কখনো পা রাখেনা' (পৃ-৮৭-ভাল্লাগেনা) তবুও যখন পতনের মহুর্তে যখন নাট্যকার বলেন 'এক অনির্বচনীয় ভবিষ্যতের উজ্জল দিনগুলি যেন এই সময়, এই মানব -মানবী তাদের সন্তানের দোলায়মান দোলনায় অনুভব করেছে গাঢ় উষ্ণতা বুকেনিয়ে।' (পৃ-৪৮-ভাল্লাগেনা) তখন যেন এক চিরন্তন আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়।

নাট্যকারের আরো নাটক গ্রন্থাগারে প্রকাশিত না হলেও বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও মুখ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ গুলি হলঃ-

ক) যে কাব্যনাট্যর প্রতীক্ষায় ছিলাম (তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পত্রিকা এয়োদশ সংখা ১৯৮৮-৮৯)
খ) উজানিয়া প্রাগুক্ত -২০০০ সাল
গ) নতুন বীজ (বেবিদ- ১৩৯৯-৩য় ও ৪র্থ বর্ষ সংখা ১)
ঘ) ভোঁর- ভয়ো প্রাগুত্ত ২৫শে বৈশাখ-১৪০৩

এর মধ্যে যে কাব্যনাট্যর প্রতীক্ষায় ছিলাম নারীও পুরুষের পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে ভাব বিনিময়ে বলা। যেমন।

'পুরুষ- নারীর স্বপ্ন আর স্বপ্নের নারীঃ উভয়ের মানে বোঝনারী ? সাযুজ্য কি দ্বৈত স্বপ্নের।
নারীঃ স্বপ্নের নারীর জন্য ঘুমে নিঝুর্মে পুরুষেরা মেতে থাকে নারীর স্বপ্নে (পৃ-৪০- যে কাব্য নাট্যের প্রতিক্ষায় ছিলাম) ভোঁর ভয়োঁ নাটকটি ক্যামেরায় Long shot, Close shot, Mid long shot ইত্যাদি চিত্রগ্রহনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তবে সমস্ত নাটকের মধ্যে এই দৃশ্য 'Longshot, ক্যামেরা পাশফেরে -সূর্য ডোবার প্রান্ত থেকে একটি লোকের সিল্যুট দৌড়ে আসছে ('ut' (পৃ-১২৫-ভোর ভয়োঁ) অথবানাটকের শেষ দৃশ্য'Longshot, পুলিশের জিপ চলে যাচ্ছে ব্রীজ পাড় হয়ে,ধূলোয় ভরে যাচ্ছে চারদিক। রিক্সাও ডুবে যায় ক্রমে যেন বিন্দু। নীচ থেকে ক্রেডিট কাস্টিং উঠে আসে।'(পৃ-১৩২-ভোর ভয়োঁ) যে অপূর্ব এক নাটকীয় আবহগড়ে তোলে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় নাটকীয় পরিবেশ নির্মানে সংযত আবেগ, দৃশ্যসজ্জা, সংলাপের উপযুক্ততা ইত্যাদি বিচারে কল্যানময় দাস প্রতিশ্রুতি বা সম্ভাবনা ময় নাট্যকার নিঃসন্দেহে।

ব্রজেন্দ্র নাথ রায়

১৯৮৫ খ্রীঃ ব্রজেন্দ্র নাথ রায় প্রচলিত লোকগাথাকে 'মৈষাল বন্ধু' নামে ৬৪ পৃষ্টা বা চার ফর্মার নাট্যরূপ দিয়ে প্রকাশ করেছেন কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের নদীর চর বা গভীর বনে খাদ্যের সন্ধানে মৈষাল ঘুরে বেড়ায়। জীবিকার প্রয়ো - জনে হিংশ্র জন্তুর বিপদকে তুচ্ছকরে স্থান থেকে স্থানান্তরে তাকে ঘুরতে হয়। প্রিয়জনের কথা ভাবার অবকাশ তার নেই। নাটকে তাই স্বামীসান্নিধ্য বঞ্চিত নারীর হৃদয় বেদনা বুক ফাটা কান্নায় ধ্বনিত হয়। তাই সেই নারী বলে

গলার কাঠি সনা মৈষাল রে
মৈশাল কুনবা দ্যাশে যাও

কার মুখ দেখিয়া মৈষাল,
জুড়াম সনার গাও মৈষাল রে'

(পৃ-৩-৪- মৈষালবন্ধু)

ভিনদেশী নারীরা মইষালকে প্রলুব্ধ করবে এই আশাংকায় মৈষালের স্ত্রীবলে

তখনে না কইচং মইষালরে
না যান গোয়াল পাড়া
গোয়াল পাড়ার চ্যাংরি গুলা জানে ধুলা পড়া
মৈষাল রে (পৃ-৬- মইষালবন্ধু)

সমগ্র নাট্যগ্রন্থে কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের উপভাষা যেন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মূর্ত হয়েছে। যেমন

'বানছা..... আরে তাই, বাথানত জল খাবার কলসি নাই।
এটা কয়দিন থাকি এইটে পড়ি আছে। কাঁত্তয়ে উদ্দিশ
করেনা।' (পৃ-১১- মইষাল বন্ধু)

সবশেষে বলা যায় এটি লেখকের কোন মৌলিকরচনানয়। প্রচলিত লোকগাথাকে বাণীরূপদানের প্রচেষ্টা মাত্র। তাই এই কাহীনির কোন মূল্যায়ন এখানে করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি-সরকারী কর্মচারী সমিতির কোচবিহার শাখার ১৬ই-১৭ই ডিসেম্বর এ অনুষ্ঠিত ৩৬ তম দ্বি বার্ষিক জেলা সম্মেলন উপলক্ষে যে স্মরনিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্তোষ কুমার দে সরকারের 'চক্রান্ত' নামে একটি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। তবে নাটকটি বিষয় বস্তু বা নাটকীয়তা বিচারে উল্লেখ যোগ্য নয়।

ভারতীয় গননাট্য সংঘ, কোচবিহার

কোচবিহারের নাটকের ইতিহাস প্রসঙ্গে ভারতীয় গননাট্য সংঘের ভূমিকা উল্লেখ না করলে থেকে যাবে অসম্পূর্নতা। ১৯৩৪ সালের ২৫শে মে বোম্বাই শহরে ভারতীয় গননাট্য সংঘ আনুষ্ঠানিক ভাবে জন্মগ্রহন করে ফ্যাসিবাদের ঔদ্ধত্যর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে।১৯৪৩ সালে কোচবিহার তখনো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়-নি,এমতাবস্থায়সলিল চৌধুরীর ' ঘুম ভাঙ্গার গান' যুবক যুবতিদের প্রভাবিত করলো। ১৯৪৫এ বিনয় রায়ের গান কোচবিহারে জনপ্রিয় হয়। যেমন - বিচারপতি , তোমার বিচার করবে যারা, নাকের বদলে নরুন পেলাম, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মাউন্ট ব্যাটেনকে নিয়ে গান জনপ্রিয় হয়। ১৯৪৯ এ মুজাফফর আমেদ (কাকাবাবু) দিনহাটা হলের মাঠে সভা করেন।এই সময় গণ নাট্যের গান পরিবেশন করেন রজত বরন রায়, গীতা রায়, সন্তোষ রায়। ১৯৪৩ সালে ভারতীয় গননাট্যর বোম্বাই শহরে সম্মেলনে করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার থেকেপ্রয়াত জন নেতা বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকারের উদ্যগে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হয় টগর অধিকারী কে। এরপর ১৯৫১ সালের কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিবারণ পন্ডিত লিখলেন ' কবিতা ' সত্তর হাজার কপি। ফলতঃ নিবারণ পন্ডিত ভারতীয় গন নাট্যর আজীবন সদস্য হন।১৯৫২ সালের প্রথম সাধারন নির্বাচনের সময় গননাট্যর যেজোয়ার আসে তাতে যে ব্যক্তিদের নাম প্রথমে আসে তারা হলেন- শিবেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, নিবারণ পন্ডিত, রজত বরণ রায়, মনমোহন সেন, জীবন দে, পানু পাল, অশোক সেন, সাধনা উপাধ্যায়(বসু), দেবী লাহিড়ী, সমর সাহা, নীরেন্দ্র নন্দী, মনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, অজিত কবিরাজ, মানিক ব্যানার্জী, নির্মল ব্যানার্জী প্রমুখ।

লোক কবি নিবারন পন্ডিত যিনি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ঘনিষ্ট ছিলেন তিনি তাঁর কার্য ক্রমের মধ্য দিয়ে কোচবিহারের গন নাট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালে কলকাতার মুসলীম ইনস্টিটিউট হলে অসুস্থ নিবারন বাবুর ব্যায় নির্বাহের জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পুলিশি নির্যাতনের ভয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঐ অনুষ্ঠান থেকে চলে যান। এই সুবিধাবাদী মনোভাবে আহত হয়ে তিনি লেখেন ঃ ৬

'আমি আগমার্কা এক জাত বৈরাগী
বুল ধরেছি ব্রজবলি
আমি নীল যমুনায় ডুব দিয়েছি
গায় মেখেছি ব্রজধূলি
আমি পীত নদীতে ডুব দিয়েছি
গায় মেখেছি ব্রজধূলি

পরবর্তী কালে শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বিখ্যাত দোতরা বাদক টগর অধিকারীকে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়ে দেন। সত্তরের দশক থেকেসমাজ বদলের হাতিয়ার হিসাবে প্রয়াত রমেশ চন্দ্র রায়, নিবারণ পন্ডিত, গৌর বরণ রায়, দিগ্বিজয় দে সরকার প্রমুখদের চেস্টায় কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে গননাট্য সংঘ প্রসারিত হয়।

১৯৭৯ সালে কোচবিহারে গননাট্যের পাঁচটি শাখা স্থাপিত হয় এগুলি হল কোচবিহার সদর , বক্সিরহাট, মাথা-ভাঙ্গা ও ট্যাঙ্গন মারী।১৯৯৩ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ি এই সংস্থা আঠারটি শাখা ও আটটি প্রস্তুতি কমিটি অধীনে একহাজার সদস্য ছিল।

এখনে কোচবিহার জেলায় ভারতীয় সংঘ গুলি , তাদের প্রতিষ্ঠা কাল ও উল্লেক যোগ্য নাটক গুলির পরিচিতি প্রদান করা হল।।

ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, কোচবিহার	১৯৮০	এবং নিত্যে মিস রূপালী সংগ্রাম
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, তুফানগঞ্জ শাখা	১৯৮৬	জনহেনরী, বোধ, হত্যারে, নতুন বউ,
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, বক্সির হাট শাখা	৭০এর দশক	শহীদের ডাক, রচনা- সুধাংশু আদিত্য
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, (কৃষ্টি-দিনহাটা)	১৯৮৫	দন্ড বিচার, শিব ঠাকুরের আপন দেশে, গরম ভাত
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, বামন হাট শাখা	—	মেহের জান, গুলশন,
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, বজ্রকন্ঠ শাখা, গোসানিমারী	–	মেহের জান, গুলশন, দেনা পাওনা
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, মাথাভাঙ্গা	১৯৭৭	রতেরাজামশাই আসছে তেড়ে,
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ, গোসাইর হাট	৮০র দশক	মেশিন, জনহেনরী,
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ জামালদহ শাখা	——	সাজানো বাগান চিচিং ফাক, তাহার নামটি রঞ্জনা
ভারতীয় গন নাট্য সংঘ শিল্পী সেনানি শাখা, গীতালদহ		স্বাধীনতার জন্য, জ্বালা, হারানের নাতজামাই অঙ্গিকার, বুড়তি বয়সে দোতরা

কোচবিহারের যাত্রাভিনয়

কোচবিহারের অভিনয় শিল্পের ইতিহাস বিচার করলে লক্ষ্যকরা যাবে যে প্রথাসিদ্ধ অভিনয়ের পাশাপাশি যাত্রা শিল্পের ধারা সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান। বরং বলাচলে যাত্রা শিল্পের প্রভাব গভীর। কেননা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মঞ্চ নির্মান করে যে নাট্যাভিনয় হয় তা মূলতঃ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শহর কেন্দ্রিক। ফলে অন্যতম বিকল্প হিসাবে যাত্রাভিনয় অন্যান্য জেলার মত কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলের নাগরিকদের বিনোদন তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করেছে বলা যায়। তাই জেলার যাত্রাশিল্পের আলোচনা বাদদিলে সংস্কৃতির অভিনয়ের সম্যক রূপটি প্রতিফলিত হবেনা। স্বাধীনতাপূর্ববর্তী কোচবিহারে যাত্রাপালা রচয়িতা হিসাবে কারোর নাম অথবা কোন যাত্রাদলের নাম পাওয়া যায়না। হয়ত বহিরাগত যাত্রাদলগুলি এখানকার যাত্রামোদিদের আনন্দবিধান করত। তবে স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ বা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত জিতেন বসাক এখন পর্যন্ত জেলার একমাত্র যাত্রাপালা রচয়িতা। জিতেন বাবুর যাত্রাপালা সর্ম্পকে আলেচনার পূর্বে কোচবিহার জেলার যাত্রাদলগুলি সর্ম্পকে সম্যক ধারনালাভ করা প্রয়োজন। নীচে ঐ যাত্রা দলগুলির এলাকাভিত্তিক পরিচিতি প্রদান করা হল। ৪

যাত্রাদলের নাম	এলাকার নাম
১। বানীতীর্থ	চকচকা (চকেহাকা)
২। জোরপাকরি রিক্রিয়েশন পার্টি	জোরপাকরি
৩। মদনমোহন ক্লাব	ঘুঘুমারী
৪। ব্রহ্মোত্তর চাতরা(ছত্র)প্রগতি সংঘ যাত্রাপার্টি	ব্রহ্মোত্তরচাত্রা (ছত্র)
৫। উত্তর আমবাড়ি ক্লাব	আমবাড়ি
৬। আমবাড়ি নিউ জিতেন্দ্র অপেরা পার্টি	আমবাড়ি
৭। তরুন সংঘ যাত্রা পার্টি	কোরিবাড়ি
৮। মারুগঞ্জ এ্যাক্সেচার পার্টি	মরাডাঙ্গা
৯। কমলা অপেরা	সিদ্ধেশ্বরী
১০। ধূমের খাতা যাত্রাপার্টি	ধূমের খাতা
১১। কাত্যায়নী থিয়েট্রিক্যাল পার্টি	বাবুরহাট
১২। উদয়ন অপেরা	পেষ্টারঝার (পোস্তার ঝার)
১৩। সঞ্জীবনী সংঘ যাত্রাপার্টি	আদাবাড়ি
১৪। শ্রীকৃষ্ণ অপেরা পার্টি	তল্লিগুড়ি (টালিগুড়ি)
১৫। সিঙ্গিমারী অরবিন্দ ক্লাব	সিঙ্গিমারী
১৬। গৌরাঙ্গ অপেরা পার্টি	খারিজা বাত্রিগাছ
১৭। মহামিলন যাত্রাপার্টি	ঘোনারকুঠি (যোগেরকুঠি)
১৮। জাগৃতি সংঘ যাত্রাপার্টি	শিলদুয়ার
১৯। মহাকালহাট সোস্যাল এডুকেশন সেন্টার	হোকাদহ
২০। শৌলমারী সোস্যাল এডুকেশন সেন্টার	শৌলমারী
২১। সবুজ পল্লী ক্লাব	বড়শাকদল
২২। মদনমোহন যাত্রাপার্টি	গোপালপুর
২৩। বাবুরহাট সজীব সংঘ	বাবুরহাট
২৪। সিদ্ধেশ্বরী কল্যানপুর সংঘ গ্রন্থাগার	সিদ্ধেশ্বরী
২৫। গীতালদহ ক্লাব	গীতালদহ
২৬। পল্লীশ্রী সমিতি	ছোটিরোয়ালমারী
২৭। সুরেশ চন্দ্র যাত্রাপার্টি	বানেশ্বর

	যাত্রাদলের নাম	এলাকার নাম
২৮।	ছদ্মবেশী সম্প্রদায়	কোচবিহার
২৯।	খাপাইডাঙ্গা যাত্রাপার্টি	খাপাইডাঙ্গা
৩০।	গ্রামীন সংঘ	ধর্মবরের কুঠী, পুন্ডিবাড়ি
৩১।	মিলন সংঘ	মরিচবাড়ি
৩২।	উদয়ন সংস্কৃতি পরিষৎ	সেপাহিটারিশকুনিবালা, পোঃ পুন্ডিবাড়ি
৩৩।	বোকালির মঠ নিউ অন্নদা অপেরা পার্টি	বোকালির মঠ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই তেত্রিশটি যাত্রাদল সরকার কতৃক স্বিকৃত । ফলতঃ এরা যাত্রাভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছথেকে কিছু পরিমানে আর্থিক সহায়তা লাভ করে।

জেলার যাত্রা দলগুলির একটি সাধারন চিত্র তুলে ধরার পর আসা যাক জেলার যাত্রা পালাকার জীতেন বসাকের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে । জিতেন বাবুর জন্ম ১৯১৭ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে । দেশ ভাগের পর বর্তমান কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে বসবাস শুরু করেন ও নিকটবর্তী ফতেমামুদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন । এপর্যন্ত তিনি ৫০ টির মত যাত্রাপালা রচনা করেছেন । এবিষয়ে তার শুভারম্ভ হয় পূর্ববঙ্গেই । পূর্ববঙ্গে লিখিত ও মঞ্চস্থ তাঁর প্রথম যাত্রাপালা হল 'মানুষ' । এছাড়া তিনি নিম্ন লিখিত যাত্রাদলগুলির সংযুক্ত ছিলেন যাদের প্রত্যেকটির জন্য অন্ততঃ একটি করে পালা তিনি রচনা করেছেন । যাত্রাদল গুলি হল 'নব প্রভাত অপেরা (পূর্ববঙ্গ), রঞ্জন অপেরা, সত্যাম্বর অপেরা, নব রঞ্জন অপেরা, আর্য অপেরা, নিউ রয়েল বিনাপানী অপেরা, নিউ গনেশ অপেরা । তার লিখিত পালাগুলি হল 'সিপাহী বিদ্রোহ (১৩৫৭), রক্তের লেখা, অগ্নি পরীক্ষা, দ্বিতীয় পানিপথ, দুর্গেশ নন্দিনী (১৩৬২), জীবন্ত পাপী, মীরাবাই , আনন্দ মঠ (১৩৬৫), কংস, লালবাই, পাপ ও পাপী, মহারাত্রী, অষ্টভূজা, সূর্যলগ্ন, আমরা কোথায়, কৃষ্ণ কালিন্দী (১৩৬৮), সম্রাট অশোক (১৩৬৫),সম্বরাসুর (১৩৬৯), শকুন্তলা, রাঙ্গা রাখী, সাবিত্রি সত্যবান (রাধা), দীপ আজিও জ্বলে, পুষ্প চন্দন, বাগদত্তা, রক্তের দাগ, নাচ ময়ুরী, রানাদিল, বিশ্বামিত্র, কর্ণার্জুন, সীমান্ত দস্যু বা সুলতান মামুদ, নিঝুম রাতের কান্না, অবাক পৃথিবী, জয়যাত্রা, শিক্ষক (শ্রী ভূমিকা বর্জিত একাঙ্কিকা), ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম, সহধর্মিনী (ভোলানাথ), দেনাপাওনা । জীতেন বাবু রচিত যাত্র পালাগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা এখানে স্বল্প পরিসরে করা হল, যা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ন রয়ে যাবে ।

যেমন — ক) মানুষ ঃ– ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত এই পালায় মানবজীবনের নানা সমস্যা এখানে বিবৃত হয়েছে । জনপ্রিয়তার জন্য এই পালার ৮ম সংস্করন প্রকাশিত হয়েছিল ।

খ) বিদ্রোহী বাঙালী ঃ– ১৩৫৮ সালে ৫ অঙ্কের এই দেশাত্মবোধক পালাটি প্রকাশিত হয়। নব প্রভাত অপেরা অভিনিত এই পালায় 'সর্বদমন' নামের নায়কের আড়ালে পালাকার নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

গ) কাজল গড় ঃ– ১৩৬০ সালে প্রকাশিত এই পালায় মূলউপজিব্য ছিল অস্পৃশ্যতা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম । বিল্বগ্রাম নট্ট কোম্পানী অভিনিত এই পালায় মোট গানের সংখ্যা ছিল ১৩ টি ।

ঘ) জয় যাত্রা ঃ– ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত এই পালার কাহিনী গড়ে উঠেছিল এক আদর্শবান শিক্ষকের মহত্তকে কেন্দ্র করে । নট্ট কোম্পানী প্রযোযিত এই পালায় পালাকার বলেছেন 'অবহেলিত' শিক্ষক সমাজ অমৃত দান করে, পরিবর্তে নিজে পান করেন বিষ । সেই বিষ পানকারী শিক্ষক আভিজাত্যের অহঙ্কারে মত্ত রাজার চাইতেও ভয়ঙ্কর হয় ।' রাজা স্বদেশে পূজিত, বিদ্যান সর্বত্র বন্দিত — চানক্যর এই উক্তি পালার মূল সুর ।

ঙ) দ্বিতীয় পানিপথ ঃ— ১৩৭০ সালে প্রকাশিত এই পালার মূল উপজিব্য বিষয় হল হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও স্বদেশ প্রেম। ১৫৫৬ এর ২য় পানিপথের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এই পালাটি আসরস্থ করে সত্যাম্বর অপেরা।

চ) ডাকিনীর চর ঃ— ১৩৭১ সালে প্রকাশিত ৫ অঙ্কের এই পালাটি অভিনিত হয় বিখ্যাত যাত্রাদল নট্ট কোম্পানীর দ্বারা।

এখানে উল্লেখ করা অসঙ্গত হবেনা যে যাত্রাপালাকার জীতেন্দ্র নাথ পালা রচনা প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যাত্রা সম্রাট বলে কথিত ব্রজেন দের পুত্র তরুন দে রচনা করেছিলেন 'বঞ্চিত সম্রাট জীতেন্দ্র নাথ'।

কোচবিহার জেলার যাত্রাভিনয় সহ নাট্যধারার ইতিহাসের স্বরূপ তুলে ধরার পর জেলার বিভিন্ন নাট্যকারদের লিখিত নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে এই পর্যায়ে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হবে।

উৎস নির্দেশ

১) তিনশ বছরের যাত্রা শিল্পের ইতিহাস — গৌরাঙ্গ প্রসাদ হাজরা।

কথা সাহিত্যের ন্যায় কোচবিহারের প্রবন্ধ রচনার অঙ্গনও উপেক্ষিত নয়। তবে এক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্ব স্বাধীনতাপূর্ববর্তী যুগের চেয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রবন্ধ রচনাই উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পূর্বযুগ যে সমস্ত প্রাবন্ধিক ও তাঁদের রচনাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কবিরত্ন (রাজখন্ড, বিশ্বসিংহ চরিতম, সংস্কৃতভাষায়), জয়নাথ ঘোষ (রাজ্যোপাখ্যান), রিপুঞ্জয় দাস(মহারাজ বংশাবলী), যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী(কোচবিহারের ইতিহাস), ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়(কোচবিহারের ইতিহাস), আনন্দচন্দ্র ঘোষ (কোচবিহারের ইতিহাস), ক্ষেত্রমোহন ব্রহ্ম (কুচবিহারের বিবরণ, কোচবিহার চুম্বক বিবরণ), নিবারণ ভট্টাচার্য (কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) খাঁ চৌদুরী আমানতউল্লা আহমদ (কোচবিহারের ইতিহাস-১ম খন্ড), হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (দি কোচবিহার স্টেট এ্যান্ড ইটস্ ল্যান্ড রেভেন্যু সিস্টেম, ১ম খন্ড), উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ (গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম), শরৎচন্দ্র ঘোষাল (বেদান্ত পরিভাষা, মিমাংসা পরিভাষা, বৈরাগ্যের পথে, আপ্ত মিমাংসা ইত্যাদি)। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আশুতোষ নাথ রায় (ঈশ্বর চিন্তার বিবর্তন-১৯৮৯), পবিত্র গুপ্ত (উত্তরবাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ), অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী (একালের শিল্পচিন্তা), রেবতী মোহন সাহা(কোচ রাজাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত), শুভাশিস দত্ত (এই মাটি, এই মানুষ উত্তরবঙ্গ ও অসমের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক), সুবোধরঞ্জন রায় (গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ১৯৮৬, গল্পকথক শ্রীরামকৃষ্ণ ১৯৯২), অরুণ মৈত্র (সিকিমের আদিবাসী লেপচা), দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ (কাব্যদর্শন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস), বিশ্বনাথ দাস (সুশীল রায় ঃ জীবন ও সাহিত্য), বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্যতত্ত্বের রূপরেখা, বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন, সাহিত্যিক ও পাঠক, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক), হরিশচন্দ্র পাল (উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা, উত্তরবাংলার পল্লীগীতি), জগদীশ চক্রবর্তী (কংসের কারাগার), চঞ্চল কুমার দাস(কোচবিহারের ইতিকথা), দিগ্বিজয় দে সরকার (বৈষ্ণবেতর বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব, লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ ইত্যাদি)।

অর্ধস্বাধীনতা পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে যাঁরা প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যাঁদের গ্রন্থ আমরা পেয়েছি সেই গ্রন্থগুলির পরিচয় ও মূল্যায়ণে আমরা ব্রতী হয়েছি।

পতিরাম সিংহ

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত পতিরাম সিংহের 'কামতারাজ্যে পৌন্ড্রক্ষত্রিয় ১ম খন্ড' দুইশত চার পৃষ্ঠার এমন একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ যাতে মোট একষট্টিটি অধ্যায় রয়েছে প্রথম অধ্যায়ে 'পৌন্ড্রদেশের নামোৎপত্তি' থেকে শুরু করে শেষ অধ্যায়ে 'রাজবংশাক্ষত্রিয় মহামিলনোৎসব'এ আলোচনার সমাপ্তি। এর মাঝে পরশুরাম প্রসঙ্গ, বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার, পৌন্ড্রদের বীর্য ও অস্ত্রধারনক্ষমতা, কামরূপ রাজ্য প্রসঙ্গ, প্রাচীন কামতারাজ্য ও কোচবিহার রাজ্য ও রাজবংশ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনার মাঝে এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, কামতারাজ্যের পৌন্ড্ররা আর্য্যবংশদ্ভুত ক্ষত্রিয় (পৃ.-২৮)। কিন্তু তার এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি যতটা প্রাচীন কাব্য, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনীর অবতারনা করেছেন ততটা নৃতাত্বিক আলোচনা করেননি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যতটা অনুমান নির্ভর ততটা বিজ্ঞানসম্মত হতে পরেনি। তবে এটা লক্ষণীয় যে, রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য করে উপবিত ধারন করবার আন্দোলন যিনি করেছিলেন সেই ক্ষত্রিয়প্রবর পঞ্চানন রায় বর্মার প্রতি তিনি যতটা শ্রদ্ধাশীল তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজদের প্রতি ততটা শ্রদ্ধাশীল নন। মহারাজাদের প্রতি সাধারণ প্রজাদের ন্যায় যুক্তিহীন মুগ্ধভাবের পরিবর্তে রাজকীয় কাযকলাপ সম্পর্কে তাঁর দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। সঙ্গত ভাবেই তিনি 'নিবেদন' পর্বে প্রশ্ন করেছেন 'রাজের প্রজাসাধারণ যখন সমগ্র রাজ্যে এ. বি. সি. ডি. শিক্ষার সুযোগ পায় নাই তখন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানীতে ভিকটোরিয়া কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ তাহা হইলে কাহাদের জন্য? আর যাহাদের জন্যই হউক রাজ্যের সাধারণ লোক ও প্রজাসাধারণের জন্য যে নহে তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্দেশীয় ছাত্রেরা প্রাইমারী, মধ্য বাংলা ও মাইনর স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তথা গুরু ট্রেনিং বা নর্মাল স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া শিক্ষকতা করিবার সুযোগ পাইত কিন্তু এই কলেজ স্থাপনের পর শিক্ষার

বাজেটের টাকাকে ঠিক রাখার জন্য গুরু ট্রেনিং ও নর্মাল স্কুল উঠাইয়া দেওয়া হয়।' বলা বাহুল্য এই মন্তব্য কোচবিহারের মহারাজাদের প্রজাহিতৈষণা ও শিক্ষানুরাগের প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে মূলে সন্দেহ জাগায়। তাছাড়া ১৮৯১ সালের ভারতের আদমসুমারীতে রাজবংশ্য ক্ষত্রিয়রা নিজেদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলে যে দাবী করেন তাও কোচবিহারের মহারাজা অগ্রাহ্য করেন বলে লেখকের ক্ষোভ ঝরে পড়েছে। যাই হোক গ্রন্থটিকে প্রচলিত ধারণার ইতিহাস না বলে এটিকে বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

সুখবিলাস বর্মা

সুখবিলাস বর্মার প্রকাশিত গ্রন্থ 'জাগ গান' একশ ষাট পৃষ্ঠা বা দশ ফর্মার এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোন প্রকাশনার বছর উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র সরকারের ভূমিকা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, গ্রন্থটি ১৯৯৭এর শেষদিকে মুদ্রিত হয়েছিল। সমগ্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 'কামদেবের জন্মগীত', 'বাঁশ সৃজন ও পূজার গান', 'কামদেব বন্দনা', 'মদনকামের নাড়ু সজ্জনের গান', বাঁশ পূজার গীতের সঙ্গে ভাঙ-এর মহিমা গীত', মদনকামের বরণের গান, জাগগানের বন্দনা, জাগ গানে শ্রীরাধার মানভঞ্জন পালাগান', 'মদনকামের মহিমা ও দলের সমস্যা', জাগ গানের পাঠান্তর', 'ধূয়া গান', 'জাগের ধূয়া', 'রাধার শাক তোলা', 'কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা, কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা', 'রাস', কুলটা রমণীর উপপতির রূপবর্ণনা' ইত্যাদি। লক্ষণীয় মদনকাম গানে রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পালারই আধিক্য। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রবন্ধকার বলেছেন, ' কামকে জাগ্রত করার গীত গানে স্ত্রী পুরুষের প্রেম ও মিলন বর্ণনা অপরিহার্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বড় তুলনীয় ঘটনা রাধাকৃষ্ণের প্রেম'। (পৃ. ৮৪) এবং তিনি আরো বলেছেন, ' উল্লেখ্য যে, মদনকামের গানের সঙ্গে যে পূজা জড়িত তা হল বাঁশ পূজা। বাঁশ পুরুষাঙ্গের প্রতীক। বাঁশ পূজার মাধ্যমে উর্বরতা ও সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। (পৃ.৮৫) এরপর তিনি এই পূজার নির্ধারিত সময়, তার কারণ, উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে আলোচনার মধ্যস্থলে এসে তিনি যেমন কামরূপের আদি অধিবাসীগণ রাজবংশী না কোচ এবং রাজবংশী ও কোচ একই জাতি কিনা এই তর্কের আভাস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। (পৃ.৮৭) তবে তাঁর এই আক্ষেপোক্তি 'সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথেসাথে সমাজে এ ধরণের গানের আদর যখন ক্রমাগত কমে আসছে, সেই সময়ের রচনা এই গান। তথাকথিত ভদ্রসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে কামরূপ অঞ্চলের বহির্দেশ থেকে আগত মানুষের সংস্পর্শে এবং এই অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার শুরুর ফলে আপাত অশালীন কথা ও ভঙ্গিতে ভরা এইগান ক্রমশ জনস্বীকৃতি হারিয়েছে।' (পৃ.৯০) অনর্থক বলেই মনে হয়। কেননা মার্জিত সংস্কৃতি বা শিষ্ট সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত। শিক্ষার অভাবে পশ্চাৎপদ মানুষ মনোরঞ্জনের কারণে এমন জিনিস আত্মস্থ করে যার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অশালীন উপাদান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষার বিস্তৃতির ফলে চেতনার জাগরণ আনে লজ্জাবোধ, ফলতঃ মানুষ অপকৃষ্ট সামগ্রি ত্যাগ করে। লেখকের বক্তব্য এটা প্রমাণিত যে শিক্ষার ক্রমবিস্তৃতিই কামদেবতাকে উৎসর্গ করা পূজা ও জাগের গানের ক্রমবিলুপ্তির কারণ। ৯৫ পৃষ্ঠায় রতিরাম দাসের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি কোচবিহারের রাজবংশের ঐতিহাসিক পরিচিতি, দেবী সিংহের অত্যাচার ইত্যাদি যেমন এনেছেন তেমনি জাগ গানের সাংগীতিক বিশ্লেষণ অংশে এই গানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চিত্রিত করেছেন। জাগ গানের ভাষা প্রসঙ্গে এতদঞ্চলের ভাষাবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে এই অঞ্চলের ভাষা কামরূপী উপভাষা এই অভিধাকে গ্রহণ করেছেন। পৃ.১২১), বাংলার অন্য অঞ্চলের উপভাষার সাথে এর ধ্বনিগত, রূপগত ও পদবিন্যাসগত পার্থক্য আলোচনা করেছেন। তবে গ্রন্থের শেষাংশে জাগ গানের স্বরলিপি প্রদান একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনেছে।

হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য যৌথভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁদের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা' একশ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকরা মেয়েদের মাঝে প্রচলিত ব্রতকথার ভূমিকা

আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'সমাজে যখন স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা, তখন বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল'। কিংবা ' কোচবিহারের লুপ্তপ্রায় ব্রতকথাগুলি ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির খনিস্বরূপ। এগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।'

সমগ্র গ্রন্থটির দশটি মূল অধ্যায়ে বিভাজন সম্ভব। প্রথম দুই অধ্যায়ে রয়েছে 'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয়' ও 'কাত্যায়ণী ব্রতকথার পরিচয়'। এরপরে রয়েছে তিনটি পূজা ব্রত পরিচিতি। এই পূজা ব্রত পরিচিতিগুলির দুটির আবার উপবিভাগ বর্ণিত হয়েছে। যেমন ষাট পূজা ব্রতে উক্‌নাই গৌরী ও ছত্রকাকই কাহিনী, দায়োবায়ো কথা, ঘটপাতানী ভাসাবার উপকথা এবং সুবচনী পূজা ব্রতের পরিচিতিতে গোয়ালিনী ও চন্ডালিনী, মনপতি ও ধনপতি সদাগর, বামনবামনী ইত্যাদি। এরপর শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি, বাটেশ্বর পূজাব্রত পরিচিতি ও একুল ওকুল পূজাব্রত পরিচিতিও বর্ণিত হয়েছে।

ব্রতগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর কোন কোনটিতে এতদঞ্চলে প্রচলিত কামরূপী উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'রাণী কইল, ''সন্দিকাই মোরটে থাউক। রাজার একটা খাসি মারি দেও যায়া'' (পৃ.৯২, দায়োবায়ো কথা)। ব্রতকথাগুলি যে শুধু নারীশিক্ষার মাধ্যম ছিল তাই নয়, এগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সমকালীন সমাজের অবক্ষয়ের দর্পণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। যেমন 'নিষ্কলঙ্ক পূজা ব্রত '(পৃ.৯)এ দেখা যায় সওদাগর বাণিজ্য যাত্রা করলে তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে একাদিক্রমে তার ছয় জন বিবাহিতা স্ত্রী কলঙ্কিনী হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে যুগের বিবাহিতা নারীদের মধ্যেও কলঙ্ক দেখা দিত। ব্রতকথাগুলির পূজার সময় বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকরা বলেছেন ' বর্তমান সামাজিক যা পরিস্থিতি তাহাতে আশঙ্কা হয় ভবিষ্যতে এ ব্রতগুলিও একে একে লোপ পাইবে। অতীত সমাজের রীতি, নীতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রার সহিত যুক্ত এই ব্রতগুলির মূল্য অপরিসীম। এইগুলির লোপে সামাজিক জীবনের যাতায়াতের প্রধান ফটক চিরদিনের জন্য অর্গল যুক্ত হইবে।'(পৃ.১৩-১৪) লেখকরা যে জিনিসটি হয়ত খেয়াল করেননি তা হল স্ত্রী আচার সহ সমাজজীবনে প্রচলিত যে কোন আচারই সমসাময়িক শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, বিশ্বাস ইত্যাদির এক অনিবার্য ফল। সমাজজীবনের অগ্রগতির সাথে সাথে ঐগুলির ধ্বংস হয় না, হয় নব রূপে রূপান্তর মাত্র।

সমগ্র গন্থে লেখকরা ব্রতকথাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করলেও এইগুলির উদ্ভবের পেছনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা, এইগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেননি বরং তাঁদের রচনায় হতাশার সুরই ধ্বনিত হয়েছে। তাছাড়া ভাষার গুরুচন্ডালী দোষও কখনো কখনো লক্ষণীয়।

আরেকটি কথা না বললে আলোচনায় অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। তা হল বাংলার অন্য অঞ্চলের প্রচলিত ব্রতকথাগুলির সাথে কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথাগুলির কোন তুলনামূলক আলোচনা করে এতদঞ্চলের ব্রতকথাগুলির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা প্রাবন্ধিকরা করেননি।

সবশেষে বলা যায় ভাল ব্রতকথা সংগ্রাহক ও সাধারণ আলোচকের ভূমিকা পালন করলেও লেখকদের আলোচনায় গবেষকসুলভ কোন বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠেনি।

মণীন্দ্রলাল কুন্ডু

মণীন্দ্রলাল কুন্ডু ১৯৯৯ সালে প্রকাশ করেছেন তাঁর একশ আঠার পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'তুলনামূলক বঙ্গীয় রাজবংশী ধাঁধা'। সমগ্র গ্রন্থে তিনি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের প্রচলিত রাজবংশী ধাঁধাগুলি জনসমক্ষে তুলে এনে বাঙ্গলার অন্য অঞ্চলে সেই ধাঁধার সমার্থক ধাঁধাগুলির সাথে পাঠকদের পরিচিতি দান করার চেষ্টা করেছেন। যেমন— কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা ঃ

ক) ' হিচিক চিকে খোঁড়ে মাটি
দশ ঠ্যাং তিন পুকটি '

এর সমার্থক ধাঁধাগুলি হল

খ) ' টাংশিয়া খুঁড়েছে মাটি
দশ ঠ্যাং তিনটা কটি' (জলপাইগুড়ি)

গ) হেঁচক কোঁচক তুলেছে মাটি
ছয় চোখ তার তিন পুকুটি (মুর্শিদাবাদ)

ঘ) খষ্ট্যাং হষ্ট্যাং
তিন পুটকী, দশ ঠ্যাং (ভাঙনখালি, ২৪ পরগণা) (পৃ. ৫১)

অথবা

'জঙ্গল থাকি বিরাইল চিতি
চিতি কয় তোর পাতত্ মুতি (কোচবিহার)'

' বন থেকে বেরুলো চিঁচি
চিঁচি বলে তোর ভাতে হাঁচি (বর্ধমান)'

'বন থাকি বাইরইল হুইত্তা
ধরলাম জাইত্তা, দিল মুইত্তা (শ্রীহট্ট)'

'বাড়থুনি নিকল্যে ঠুঠ্যা
ভাত ভরি দিএ মুত্যা (চাকমা/চট্টগ্রাম)' (পৃ.৫৫)

প্রবন্ধকার ধাঁধা রচয়িতাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে স্থুল রুচির রচয়িতাদের কথা যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি উচ্চ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন রচয়িতাদের কথাও বলেছেন। যেমন—

'কাঠের গাই কাঠের বাছুর
বাছুরের গালাত দড়ি
দুধ দেয় গাই টুপুর টুপুর
বাছুর খায় পেটটা ভরি' (পৃ.১৭)

এখানে হেঁয়ালীর মাধ্যমে খেজুর গাছের কথা বলা হয়েছে।
আবার যখন বলা হয়—

'গাছ কাটং গাছালি কাটং
আরও কাটং গাছের মাথা
শয়ে শয়ে কুড়ালি ভাঙে
তেওনা যায় কাটা ' (পৃ.১৭)

এখানে রূপকের অন্তরালে নিজের ছায়ার কথাই বলা হয়েছে। এই ধরণের রূপকের প্রয়োগ অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের কাব্যিক মননেরই পরিচয় দেয়।

তবে আলোচনার শুরুতেই লেখক বলেন 'কিছু আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সত্বেও রাজবংশী সংস্কৃতি একই অখন্ড বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কেউ যদি তা অস্বীকার করেন তবে তাকে যথার্থ সংস্কৃতি সচেতন বলা যাবে না' (পৃ.২৩) এই সচেতনতাবোধের তাড়নায়ই তিনি ভাষার উৎস, বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন বহুযুগধরে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা ও প্রবাদ প্রবচনগুলির তুলনামূলক অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। সবশেষে তিনি এই সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 'রাজবংশী উপভাষা কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র ভাষা নয়, বাংলা ভাষারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর কিছু নিজস্ব বিশিষ্টতাকে স্বীকার করে নিয়েও আমরা নিঃসংশয়ে এই উপভাষাটিকে বাংলা ভাষারই একটি গৌরবময় অংশ বলে অভিহিত করতে পারি।' (পৃ. ২৫)

বিশ্বনাথ দাস

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত বিশ্বনাথ দাসের গ্রন্থ 'কোচবিহারের পুরাকীর্তি সংগ্রহ' মন্দির মসজিদ ও প্রাসাদ ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিক অবশেষের মাধ্যমে কোচবিহার রাজ্যের পরিচিতি তুলে ধরার প্রয়াস। ৬৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ১১টি অধ্যায়ে কোচবিহার জেলার ২৬টি মন্দির, মসজিদ ও রাজপ্রাসাদের কথা আলোচনা করেছেন লেখক । তাছাড়া শেষ অধ্যায়ে রাজকীয় মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

তবে লেখকের অবৈজ্ঞানিক মনোভাব সবচাইতে বেশি প্রকট হয়েছে যখন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, সেই গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বসবাসের জন্য কোন মুসলমান বসবাস করতে পারেনা এবং স্থানীয় এই কিংবদন্তী অমান্য করে দেশ বিভাগের সময় কয়েকটি মুসলমান পরিবার এই গ্রমে বসবাসের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যে তাদের কয়েকজন ভয়ংকর অসুখে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় বাকিরা ঐ গ্রাম ত্যাগ করে। কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা কিংবদন্তীকে গ্রামাঞ্চলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা দান করতে পারে। কিন্তু গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ অবচেতন মনে অবৈজ্ঞানিক কিংবদন্তির প্রতি লেখকের বিশ্বাসকে মূর্ত করে তোলে যা গবেষকসুলভ নয়।

হেমন্ত কুমার রায় বর্মা

হেমন্ত কুমার রায় বর্মা ১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'কোচবিহারের ইতিহাস'। প্রচ্ছদে লেখক গ্রন্থ পরিচিতিতে বলেছেন 'কামতাপুর তথা বেহার বা কোচবিহার রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের জাতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজবংশের ইতিহাস।' বুঝতে অসুবিধা হয় না লেখক কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের ইতিহাস একার্থক বলে গণ্য করেছেন। কোচবিহার উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার অন্যতম হলেও একমাত্র নয়। তাই অংশ কি করে সমগ্রর পরিচয়বাহী হয় তা বোধগম্য নয়।

সমগ্র গ্রন্থে আঠাশটি অধ্যায়ে লেখক কোচবিহার নামের উৎপত্তি, ভাষা, ধর্ম, ব্রতকথা, দরবারী সাহিত্য, রাজবংশ পরিচিতি, প্রবাদ প্রবচন, জাতি উপজাতি পরিচয় থেকে শুরু করে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের সময় ভারতভুক্তি পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে কোচবিহার রাজ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু ধারনা লাভ সম্ভব হলেও কিছু কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকমনে উত্থাপিত হয়। যেমন — রাজবংশী জাতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ' এই রাজবংশী শব্দটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এই জাতি আর্য্য এবং সংস্কৃতভাষী। রাজবংশী শব্দের অর্থ রাজার বংশ। প্রাচীন ভারতের রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং রাজবংশ হইতে উদ্ভুত বলিয়া রাজবংশী জাতি ক্ষত্রিয় ইহাই প্রামাণিত হয়।

উত্তরবঙ্গে একটিমাত্র আর্য্যজাতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন 'কম্বোজরাজ গৌড়পতি' যাহাদের কথা দিনাজপুরের প্রাপ্ত স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত আছে।' (পৃ.১৩-১৪)। একটিমাত্র স্তম্ভলিপির উপর ভিত্তি করে এই ধরণের সিদ্ধান্ত উপস্থিত হওয়া গবেষকসুলভ নয়। তাছাড়া তাঁর যুক্তি অনুসরণ করলে সাঁওতালজাতিও আর্য্য

বংশদ্ভুত, কারণ 'সাঁওতাল' শব্দটি তৎসম 'সামন্তপাল' জাত। তাছাড়া কোচবিহারের অধিবাসীরা সংস্কৃত ভাষাজাত বাংলাভাষা ব্যবহার করে এই যুক্তি অনুসরণ করলে বাংলার প্রাগার্য জনগণের সবাই আর্য্যজাতিসম্ভুত বলতে হয়। কেননা তারা সবাই বর্তমানে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে।

তবে লেখক বর্তমানে এতদঞ্চলের ভাষাকে বাংলা ভাষা থেকে পৃথক একটি ভাষা হিসাবে গণ্য করার অপচেষ্টার বিরোধীতা করেছেন। তাঁর ভাষায় 'বর্তমানে কিছু লেখক উত্তরবঙ্গের এই আঞ্চলিক ভাষাকে 'রাজবংশী' ভাষা বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রাচীন জাতিগুলির ভাষাকে কোন এক বিশেষ জাতির নামে 'রাজবংশী ভাষা' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত।' (পৃ. ৮১)

বলা চলে কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা ব্যতিরেকে গ্রন্থটির দ্বারা স্বল্পপরিসরে কোচবিহার রাজ্যের ঐতিহাসিক পরিচিতির কিছু কিছু দিক উদ্ভাসিত হয়েছে।

বীরেন সাহা

১৯৯৯ সালে বীরেন সাহা প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থ 'উত্তরবঙ্গের কথা'। আটাত্তর পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তিনটি অধ্যায়ে লেখক উত্তরবঙ্গের পরিচিতি তুলে দরার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গ পরিচয়'এ লেখক উপ-বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। এগুলি হল 'কোচবিহারের ইতিহাস, 'সংস্কৃতি', 'ভাষা', 'রাজবংশী ভাষা' ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন 'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচিতি, জনজাতি পরিচিতি, ভাষা পরিচিতি ইত্যাদি। যদিও ৩৬-৩৭ মাত্র দুই পৃষ্ঠা কোচবিহারের ইতিহাস বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিহ্নিত না করলেও ২৩-২৯ সাত পৃষ্ঠায় বর্ণিত উত্তরাঞ্চলের ইতিহাসের অধিকাংশই ঐতিহাসিক কোচবিহার রাজ্যের। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির ধারা বর্তমান উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিসীমার বাইরে অসমের কামরূপ গোয়ালপাড়া থেকে বাংলাদেশের রংপুর-দিনাজপুর-বগুরা, মেঘালয়ের তুরা জেলার অংশ বিশেষ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে তিনি বর্ণনা করেছেন যা যথাযথ, যদিও একই উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের সংস্কৃতির মধ্যে যে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে তার পরিচয় তিনি পরিস্ফুট করেননি। তবে যখন তিনি বলেন, ' লোকজীবনের প্রতি পরতে পরতে এই যে সাংস্কৃতিক মিলন এরই ফলে, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি সুরের রেশ পাই উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানে আর মালদার গম্ভীরা নাচের মিল পাই পুরুলিয়ার ছৌনাচের গানে' (পৃ.৩৮) তখন উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গের অন্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যকেই তুলে ধরেন, যদিও সেই সাদৃশ্যর কারণ কি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেননি, এমন কি দেশভাগ পরবর্তী খন্ডিত উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক অখন্ডতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা উদঘাটন করার চেষ্টা করেননি।

'কুড়ি বছর আগে' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৭ এই কুড়ি বছরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারী, বেসরকারী বা পঞ্চায়েতী উদ্যোগে অর্জিত অগ্রগতি এবং একই সঙ্গে পশ্চাৎপদতার চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। সবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার সাথে সাক্ষাৎকারান্তে লেখকের মন্তব্য ' বিচ্ছিন্নতাবাদ রুখতে যোগাযোগ এবং উন্নয়ণ এক বড় হাতিয়ার। আর আঞ্চলিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন তো সমগ্র সংস্কৃতিকেই সমৃদ্ধতর করে।' (পৃ. ৭৮) এক সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যাই হোক এত স্বল্প পরিসরে সমগ্র উত্তরবঙ্গের পরিচিতিদান সম্ভব না হলেও এই গ্রন্থটিকে উত্তরবঙ্গের পরিচিতিদানের প্রচেষ্টা বলা অসঙ্গত নয়।

শচীনন্দন ঘোষাল

শচীনন্দন ঘোষাল জন্মসূত্রে কোচবিহারের লোক না হলেও তাঁর সমগ্র কর্মজীবন অতিবাহিত হয়েছে কোচবিহারে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ'। সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির বাইরেও অন্য একটি দিক ছিল যার যথোপযুক্ত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের সার্বিক সত্তাকে উন্মোচিত করে সেই দিকটিই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। একশ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে মোট অধ্যায় আছে আটটি

প্রথম অধ্যায়ে তিনি পল্লী উন্নয়নে ফরাসী বুদ্ধিজীবি রঁইগিলবার্তের ভূমিকা, ফিজিওক্র্যাট দর্শন, বাংলার চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থা, রাজা রামমোহনের ভাবনা, ১৮৯০ সালে জমিদারী দেখাশোনার ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের

কলকাতা থেকে শিলাইদহ যাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন গ্রাম ও শহরের ক্রমবর্ধমান পার্থক্য কিভাবে পল্লী উন্নয়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে আগ্রহী করে তোলে। তাই প্রথম অধ্যায় 'পল্লীচিন্তার ঐতিহ্যবাহিতা'র শেষাংশে তিনি মন্তব্য করেছেন 'তাই আসমানদার হয়েও গ্রামের মাটি ও মানুষের কথা ভেবেই পল্লী উন্নয়ণের সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পল্লীবাসীর সামাজিক নিরাপত্তাবোধের উপকরণ গড়ে তুলতে, গ্রামের মানুষের আত্মমর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং শ্রমমর্যাদাবোধকে গ্রাম ও শহরে একই ধারায় বইয়ে দিতে নিজের 'সর্বস্বপণ' করেছিলেন।(পৃ.১৬)' রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়ণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন 'শ্রীনিকেতন'. যদিও এই কর্মকান্ডের সূত্রপাত হয়েছিল কুষ্ঠিয়া জেলার শিলাইদহ অঞ্চলে। লেখকের মতে 'শিলাইদহ হল পল্লীউন্নয়ণ চিন্তার সূতিকাগার।(পৃ.২৩) রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল 'তিনি পল্লী উন্নয়নের চিন্তায় নেতাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এই কারণে যে, গ্রামীণ ভারতবর্ষে প্রধান সমস্যা হইল গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যা।(পৃ.৪৯) তবে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ণ ভাবনা যে সে যুগের অনেক রাজনীতিকই গ্রহণ করতে পারেননি একথাও তিনি জানিয়েছেন(পৃ.৪৯) জমিদার রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভাবধারাকে শিলাইদহ বা অন্য জমিদারিতে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হলেন না তখন শ্রীনিকেতনে তাঁকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

পল্লী উন্নয়ণ প্রসঙ্গে গান্ধীজী ও স্পেনসর হ্যাচের মতামতও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া পল্লী উন্নয়ণ প্রকল্প ও সমষ্টি উন্নয়ণ প্রকল্প ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। আলোচনান্তে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এই গ্রন্থে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও রবীন্দ্রনাথের এমন দিক আলোচিত হয়েছে যা তাঁর চরিত্রকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে তুলে ধরে।

দীপায়ন ভট্টাচার্য্য

দীপায়ন ভট্টাচার্য্যের প্রকাশিত নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ 'নান্দীপাঠ' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৯ সালের ৮ই জুন। ৩৬ টি পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। 'নাট্যকর্মীর আত্মসমীক্ষা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় লেখক বলেছেন 'গ্রুপ থিয়েটার ঘুম-পাড়ানি গান গায়না, গায় জাগরণী সঙ্গীত (পৃ.৩)'। এই নিরীখে গ্রুপ থিয়েটারের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি এটা বলতেও ভোলেননি 'নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবর্তনের আভাষ যুক্ত নাটকই আমাদের পছন্দ। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এটা নয় যে, আরোপিত বিপ্লবিয়ানায় আমরা তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলব।'(পৃ.৩)। বস্তুতঃ এই আরোপিত বিপ্লবিয়ানার ফল হিসাবে বাংলা নাটকে যত জোতদার নিহত হয়েছে বাস্তবে একশতাংশও তাঁর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ফলে সমস্ত নাট্যদৃশ্য যে দর্শকের কাছে বাস্তবের সাথে সম্পর্ক রহিত হওয়ায় ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে এ সম্পর্কে লেখক সচেতন। তাছাড়া প্রগতিশীলতার নামে দর্শককে নিছকধোঁয়াশার মধ্যে রেখে দেওয়ার বিরুদ্ধেও লেখক তীর্যক মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া লেখকের মন্তব্য 'বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ ভারতবর্ষের একটি রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গেই বাংলাভাষার বেশ কটি প্রশাখা রয়েছে। একজন নাট্যকর্মী ব্যাপকতর জনগণের দরজায় কড়া নাড়তে কেন তাদের ভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেবেন না।'(পৃ.৩) বোঝা যায় ভাষাগত ব্যবধান যে বাংলা নাট্য আন্দোলন বিস্তৃতি লাভের পথে অন্তরায় সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যথেষ্টভাবেই সচেতন। তবে গ্রন্থের ১৯ নং পৃষ্ঠায় 'তাই যে অঞ্চলে নাটক হবে সেই অঞ্চলের উপভাষা নাটকে স্থান পেলে দর্শক উৎসাহিত হবেন, নাটকটিও তাদের পক্ষে সহজবোধ্য হবে' বলার মাধ্যমে একই প্রসঙ্গের ঘুরিয়ে পুনরুক্তি করার ফলে বিষয়ের চর্বিতচর্বন হয়েছে বলা যায়। ৪নং পৃষ্ঠায় দর্শকদের গিনিপিগ করে অহেতুক নাটকীয় পরীক্ষা নীরিক্ষার ফলে যে নাটকগুলি ভঙ্গিসর্বস্ব ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে এই দিকটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।(পৃ.৪)। তবে আর্থিক দৈন্যদশাজনিত কারণে উপকরণের অভাবে গ্রুপ থিয়েটারগুলি যে বাচিক অভিনয় ও অঙ্গসঞ্চালনের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল এবং তা অস্বাস্থ্যকর এটাও লেখক উল্লেখ করতে ভোলেননি এবং নাটকের মানোন্নয়ন করে স্থায়ী সমাধান করা ছাড়া এই সমস্যার চটজলদী কোন সমাধান নেই এটা উল্লেখ করেছেন(পৃ.৫-৬)। তাছাড়া 'গ্রুপ থিয়েটারগুলির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র না থাকলে বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে আদর্শ ও নেতৃত্ব দেবার নৈতিক অধিকার তাদের থাকবেনা বলে ম

মন্তব্য (পৃ.৭) করেছেন তা যথাযথ হলেও গ্রুপ থিয়েটারগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির কারণ হিসাবে নাট্য প্রতিযোগিতাকে দায়ী করেছেন তা নিয়ে ভাবার অবকাশ রয়েছে (পৃ.৭)। কারণ প্রতিযোগিতাই যদি বিদ্বেষের কারণ হয় তবে তা শুধুমাত্র নাট্য জগৎ কেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। তবে কখনো কখনো কিছু কথা আপাত বিরোধী বলে মনে হয়। হয়ত লেখক বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে খেই হারিয়েছেন। ফলে পারম্পর্য্য বজায় থাকেনি। যেমন ' এখন তাই আমাদের নতুন করে ছক কষতে হচ্ছে দর্শক টানবার জন্য। দর্শকদের মন ভেজানোর কোন অব্যর্থ দাওয়াই আমার জানা নেই, আছে কিছু গঠনমূলক ভাবনা'(পৃ.১৫)। এই বক্তব্য উপস্থাপনের পর আবার দর্শকের উপরই চূড়ান্ত আস্থা স্থাপন করে বলেছেন ' শিল্পোত্তীর্ণ নাটকের টানে জনগণই আমাদের পথ চলার পাথেয় যোগাবেন। অনেকে বলেন গ্রামের মানুষ নাটক প্রযোজনার খরচ দেবেন কোত্থেকে? তারা হয় তো ভুলে যান, যাত্রাদলের মালিকদের ব্যবসা চলছে কিন্তু মূলতঃ ঐ গ্রামের মানুষের পয়সাতেই'(পৃ.২০)। অর্থাৎ দর্শক টানার মন্ত্র যে শিল্পোত্তীর্ণতা যা নাট্যকারদের নিজেদের হাতেই রয়েছে এই সত্যতার স্বীকৃতি তিনি দিলেন সুতরাং ব্যর্থতার মূল কারণ দর্শকদের মধ্যে নেই, আছে অভিনেতাদের মধ্যে প্রকারান্তরে তাই স্বীকৃত হল।

তবে নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ তিনি গ্রন্থের বিস্তৃত পরিসরেই করেছেন। যদিও এসম্পর্কে গৃহিত মতামতগুলি মূলত এ্যারিষ্টটলের 'পোয়েটিক্স' ও নাট্য শাস্ত্রবিদ ভরত থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা নাট্যরসিক মাত্রেরই জ্ঞাত (পৃ.২৫-২৬)। তাছাড়া চরিত্রের মানস ক্রিয়ার সাথে আলোর প্রক্ষেপ কোণ, গভীরতা, বর্ণ, আওয়াজ, সুর, গীত, ছন্দ, মঞ্চের সেট, তল, রেখা, দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ, স্থিতিস্থাপকতা, ভারসাম্য, ভর অথবা বৈশাদৃশ্যর প্রভাবের সুন্দর আলোচনা করেছেন(পৃ.৩৩)। তাছাড়া সঠিক চরিত্র রূপায়নে কে? কেন? কখন? কোথায়? কিভাবে? এই প্রশ্নগুলির মিমাংসা যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি(পৃ.৩৪)। তবে গ্রন্থে নাটকের ফর্ম, অভিনেতাদের অভিব্যক্তি, ভঙ্গিমা, মড্যুলেশন বা কণ্ঠস্বরের সঠিক ওঠানামা সম্পর্কে আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হলে এর পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হত সন্দেহ নেই। তাছাড়া এই গ্রন্থে প্রসেনিয়াম থিয়েটার বা প্রথাসিদ্ধ মঞ্চনাটক ও থার্ড থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য ও ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। যদি তা করা হত তবে হয়ত বইটির পরিসর আরও ব্যপ্ত হত। যাই হোক একজন নাট্যকার হিসাবে যেভাবে সংসাহসের সাথে নিজেদের ব্যর্থতা ও নাট্যকার ও দর্শকের মাঝের কমিউনিকেশন গ্যাপ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তিনি আলোচনা করলেন তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীপায়ন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ 'কোচবিহারের নাট্যচর্চা—একটি অনুসন্ধান' একশ উনিশ পৃষ্ঠার এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের সময় প্রচলিত অভিনয়কলা থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কোচবিহারের নাট্যচর্চার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছে। অবশ্য এখানে নাট্যচর্চা বলতে নাট্যাভিনয়ের দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে। নাটক রচনার দিকটি আলোচিত হয়নি বলা চলে। কোথাও কোথাও প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

লক্ষণীয় যে, লেখক এখানে তাঁর রচনাকে কালানুক্রমিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি। যেমন ১৯০৭ সালের তারাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের উদ্যোগে ' কোচবিহার ড্রামাটিক ক্লাবের স্থাপনার প্রসঙ্গের(পৃ.৯) পর ১৮৯৫ সালের ল্যান্সডাউন হল স্থাপনার প্রসঙ্গ(পৃ.১০) অথবা ১৯৩৩ সালের কোচবিহার ক্লাবের নাটকের প্রসঙ্গের(পৃ.১১) পর ১৯৩২ সালের 'বাণীমন্দির ক্লাবের' প্রসঙ্গ আলোচনার কথা উল্লেখ করা যায়(পৃ.১১)।

তবে এই গ্রন্থে কোচবিহার জেলার নাট্যমঞ্চগুলির অবস্থান, প্রতিষ্ঠা কাল, উচ্চতা, প্রস্থ, গভীরতা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং কোচবিহারের বিভিন্ন নাট্য দল, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। যেমন নিখিল ভট্টাচার্য, সুখেন্দু সেন, ষষ্ঠী ভৌমিক, শচীন মিত্র, ছানা গুপ্ত, দীপিকা চৌধুরী, হাসি নাগ প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী এবং নাট্য জগতের উৎসাহদাতা হিসাবে ললিত বক্সীর নামের উল্লেখ করা হয়েছে(পৃ.২২-২৩)। তবে সমগ্র গ্রন্থে সূচিপত্র বা অধ্যায় বিভাজন না থাকায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ বলা অসঙ্গত নয়।

দীপায়ন ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পনের পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'অমুকবাবুকে ঘোষণাকেন্দ্রে ডাকা হচ্ছে' এমন একটি রচনা যাতে কোন পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়নি এবং প্রকাশনার বছর চিহ্নিত করা হয়নি। বস্তুত এটি

কি করে সুশৃঙ্খলভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে হয় সেই সম্পর্কে ৯টি আলোচনাংশে লঘুচালে বর্ণিত এমন একটি পুস্তিকা যার নান্দনিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

রণজিৎ দেব

রণজিৎ দেবের প্রকাশিত বৃহদাকার প্রবন্ধগ্রন্থটি হল 'উত্তরবঙ্গের চিঠি'। ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই বইটিতে মোট ১০৫টি পৃষ্ঠা রয়েছে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় ফর্মা। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার তথ্যসূত্র হিসাবে মোট ৩৯টি গ্রন্থ ও দুটি সাময়িকপত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি পত্রাকারে রচিত। জনৈকা শাশ্বতী নামের নারীকে লিখিত আঠারটি পত্রে মোট ছাব্বিশটি প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন যার মধ্যে কোচবিহারের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক অতীত ও নিকট বর্তমান প্রসঙ্গে লেখকের মতামত ব্যক্ত হয়েছে। এতে দেখা যায় লেখক ভাওয়াইয়া গান, গোরখনাথ ও গম্ভীরা গান, কোচবিহারের নামকরণ ও রাজবংশাবলী, বিচারব্যবস্থা, মন্দির ও পূজা প্রসঙ্গ, মেলা, ভাষা ও শব্দ উচ্চারণরীতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় লেখক ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই গানের উৎপত্তির কারণ গল্পচ্ছলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং তার শ্রেণীভেদ করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন চিতান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, মইষালী ভাওয়াইয়া বা সোয়ারীচাল ভাওয়াইয়া, দীঘল নাষা ভাওয়াইয়া ও গড়ান বা করুণ ভাওয়াইয়া।(পৃ.১২) তাছাড়া আরও বিভিন্ন ভাওয়াইয়া গানের অংশবিশেষ যেমন ' ওকি গাড়িয়াল ভাই ও শ্যাম কালিয়ারে' ইত্যাদির আলোচনা করে মূর্চ্ছনা আনবার চেষ্টা করেছেন তবে 'ও শ্যাম কালিয়ারে /ক্যানরে কালা বাঁশী বাজাইস শুন দুপুর সনে।। / যখন কালা মুই আঙিনা সামটোঙ্ / তোর বাঁশীর কালা বাজনা শোনোঙ্ / ওরে হাতের বারুন পড়িয়া যায় / মোর ঐ বাঁশীর সুরে।।'(পৃ.১৪) অথবা ' ও প্রাণ সজনি কার আগে কব দুঃখের কথা / মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায় মোর আঙিনা দিয়া ঘাটা'(পৃ.১৭) এই দুটি সঙ্গীতাংশের প্রথমটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখন্ডের 'কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নই কূলে / কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ী এ গোঠ গোকূলে / আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন / বাঁশীর শব্দে মোর আউলাইলো রান্ধন' পদটির আর দ্বিতীয় সঙ্গীতাংশের সাথে বৈষ্ণব পদাবলীর 'আমারি বঁধূয়া আনবাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া' পদটির আশ্চর্যজনক সাদৃশ্যর বিষয়টি উহ্য রাখা বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তবে এই পর্বে বিভিন্ন ভাওয়াইয়া গায়কদের যেমন আব্বাসউদ্দীন ও তাঁর কন্যা ফেরদৌসী বেগম, সুরেন্দ্র বসুনীয়া, বিরজা সেন, কেশব বর্মণ, গঙ্গাধর দাস, কেদার চক্রবর্তী, ধীরেন সরকার, নায়েব আলী (টেপু), প্যারিমোহন দাস (পরবর্তীকালে পঃ বঃ সরকারের লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত), চিন্তাহরণ রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ (পৃ.১৩-১৪) ও তাঁদের সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা প্রশংসনীয়।

তবে গানগুলির ভাবগত আবেদন নিয়ে তিনি যতটা আলোচনা করেছেন ততটাই উপেক্ষিত হয়েছে তাদের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক কারণগুলি। যেমন ' আইলৎ ফোটে আইল কাশিয়া দোলাৎ ফোটে হোলা / ও হোরে বাপমায় ব্যাচেয়া খাইছে সোয়ামী পাগলারে'(পৃ.১২-১৩) এই গানটির কোন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তিনি লেখক আলোচনা করলেও কয়েকটি জনজাতির নাম, বনজ সম্পদ, চা বাগান (পৃ.৯৫-১০৩) ও জল্পেশ মন্দির (পৃ.৫৭) প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার কথাও আলোচিত হয়েছে তাছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার আর কোন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। অন্যান্য জেলার প্রায় কোন প্রসঙ্গই আলোচিত হয়নি। হয়ত এটি প্রথম পর্ব বলে। কিন্তু লেখক অদ্যাবধি আর কোন পর্ব প্রকাশ না করায় মনে হয় জেলাওয়াড়ী সীমারেখা মেনে এটিকে মাত্র কোচবিহার পর্ব করলে আলোচনা সুশৃঙ্খল হত। তাছাড়া পূর্ববঙ্গগত অভিবাসী সম্প্রদায় যারা গাণিতিক হিসাবে এক বৃহত্তর অংশ এবং সমান্তরাল ভাবে নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে আছে তাদের সংস্কৃতির স্বরূপটি তুলে ধরবার কোন চেষ্টা করেননি। ২০ নং পৃষ্ঠায় মালদহ জেলার গম্ভীরা গানের তিনি আলোচনা করলেও এবং তাদের গায়ক পরিচিতি তুলে ধরবার চেষ্টা করলেও মালদহের আলকাপ গানের নামোল্লেখ ছাড়া তিনি কিছুই করেননি। অথচ বিশ্লেষণের অভাবে পাঠক এই সমৃদ্ধ সঙ্গীত প্রবাহ সম্পর্কে জানতে পারলেন না। ৬১ নং পৃষ্ঠায় বাণেশ্বর শিবমন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'পেচ্ছাপ' শব্দের প্রয়োগ অসংস্কৃত ও শ্রুতিকটু বলেই মনে হয়। ৬৩ নং পৃষ্ঠায় লেখক গারো সম্প্রদায় সম্পর্কে

আলোচনা করতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য 'তবে এই গারোরা যেখানেই বাস করেছেন সেখানেই কিছু না কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। গোয়ালপাড়ায়, যোগীঘোপা, বাঘমেলা পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলেও গারোদের উপর হামলা হয়'-এর যথাযথ কারণ অনুসন্ধান করে লেখক তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেননি। ফলে আকস্মিক এই মন্তব্যে যে গারো সম্প্রদায়ের দায়ভাগ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হতে পারে এই সম্ভাবনার কথা হয়ত লেখক ভাবেননি।

তাছাড়া আবেগ বাহুল্যও লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন ১৯ নং পৃষ্ঠায় ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে তিনি মন্তব্য করেছেন 'বনের পশু ও পাখীও ধরা দেয় নারী-হৃদয়ের ব্যাকুল বেদনায়। শীতের শিশির-ঝরা রাত বনের স্নিগ্ধ নীলিমা নম্র আবরণে ঢেকে রাখে। চকিত চঞ্চল হরিণী বিদ্যুৎ চমকানোর মত কোথায় সচকিত করে দিয়ে যায় তারই পূর্ণ উপলব্ধিতে কবির গান.' কোরা কান্দে, কোরী কান্দে/ ও বন্ধু কান্দে বালিহাঁস/বনের হরিণীরে কান্দে/ছাড়িয়া মুখের গ্রাস'—এই ধরণের উদাহরণ সারা বই জুড়েই ছড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য মাত্র আবেগ বিহ্বলতার বাড়াবাড়ি যে গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ গতিকে বিড়ম্বিত করে তাতে কোন সন্দেহই নেই। এছাড়া ৮২ নং পৃষ্ঠায় শঙ্করদেব সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও তাঁর সাহিত্যকর্ম ও মনবর দুর্গাবর যারা বঙ্গ-আসামের যৌথ সম্পদ বলে গণ্য তাঁদের সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয়নি। যাই হোক অনেক ত্রুটি সত্বেও এটি উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক না হলেও অঞ্চল বিশেষের (কোচবিহার) সামগ্রিক চিত্রকে তুলে ধরতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ও বিদ্যাসাগর অধ্যাপক শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী ভূমিকাংশেই মন্তব্য করেছেন ' সাধারণ পাঠকশ্রেণী যাঁরা উত্তরবঙ্গের মানুষ ও প্রকৃতিকে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়, উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক রাজ বংশ-মানুষ-দেবতা-দেবমন্দিরাদির কথা জানতে চান তাদের জিজ্ঞাসার জবাব উত্তরবঙ্গের চিঠির করেননি। শুধুমাত্র ৮৭ নং পৃষ্ঠায় রাজবংশী শব্দগুচ্ছের বিশ্লেষণে বলেছেন 'ব্যাচে খাইছে'র অর্থ হল 'বিয়ে দিয়েছে'। বস্তুত কন্যাপণ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় দরিদ্র পিতা অর্থলোভে কন্যাকে পাগল স্বামীর সাথে বিয়ে দিয়েছেন যা বিক্রিরই নামান্তরমাত্র তাকেই ব্যথিত নারী হৃদয় 'ব্যাচেয়া খাইছে' বলে বর্ণনা করেছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের মানুষের শোষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন 'আমি মানুষের সঙ্গে অফুরান মিশতে শিখে জেনেছি, প্রতিটি মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুষ্টবুদ্ধি ও প্রতারণা'(পৃ.১৬)। মানবিক চরিত্র সম্পর্কে অহেতুক সাধারণীকরণ বলা যায়।

কোচবিহারের নামকরণ অধ্যায়ে (পৃ.২২) দেখা যায় লেখক কোচবিহার নামের উৎপত্তির কারণ হিসাবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা স্থানীয় ক্ষত্রিয় বিজ্ঞজনের অনেকেই প্রামাণ্য মনে করেন না। কিন্তু জেলার সরকারী নাম কোচবিহার হওয়া সত্বেও তিনি নিজে অধিকাংশ সময়েই 'কুচবিহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটি স্ববিরোধীতা, তাছাড়া 'রিয়াজোম সালাতিন'-এর উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তাঁর ভাষা মাধ্যমকে বর্ণনা করেছেন ফরাসী ভাষা, অথচ তাহবে ফারসী যা পারস্য বা ইরান দেশসম্ভূত।(পৃ.২৯)। তবে ২৮ নং পৃষ্ঠায় কান্তেশ্বর রাজা বা নিলাম্বরের পাঠানদের সাথে যুদ্ধের পর পরিণতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে লেখক পারেননি। এসম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ রচিত ' কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত দুটি পরিণতির অর্থাৎআত্মহত্যার ও পলায়নের উল্লেখ সংগত মনে করেছেন। তবে কোচবিহারের প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা ও মন্দির সম্পর্কে আলোচনা ইতিহাসানুসারীই হয়েছে। তবে বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কেননা কোচবিহার সম্পর্কে আলোচনা (পৃ.৪৭) করতে গিয়ে অধিকাংশ পুস্তকেই এই মহাযোগী সম্পর্কে আলোচনা উহ্য থাকে।

তবে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জলপাইগুড়ি অঞ্চলের জনজাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যেভাবে টোটো, গারো, মুন্ডা, রাভা, সাঁওতাল, মেচ প্রভৃতিদের বিবাহ, সামাজিক আচার ও আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাতে তাদের নিখুঁত জীবনচিত্র (পৃ.৬৩-৭৪) ফুটে উঠেছে বলা যায়। যেমন মেচেদের প্রেমজ বিবাহ 'হামজা ম্লাইনাই হাবা', পাত্রকে পাত্রীর বাড়ীতে রেখে চাষবাস করিয়ে কন্যাদান 'কাধে ধ্বনাই' ইত্যাদি শব্দগুলি (পৃ.৬৮) তারই পরিচায়ক। এতে এই জনজাতিগুলির মাতৃতান্ত্রিক রূপটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া রাজবংশী ভাষার ছড়া 'মাচের মধ্য রুই আড়ি / পাঁড়িত করে গাবুর নারী / হায়রে পাঁরিত কাচা দৈ-এর হাড়ি (পৃ.৭৫)' অথবা ' কয়া গেইছে রাবণে / পরাক দুঃখ দিলে দুঃখ পাবে আপনে'(পৃ.৭৯) এইগুলির মধ্যে গ্রাম্যকবির

স্বাভাবিক উপমাবোধ লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তাছাড়া ধাঁধাঁ যা সাধারণভাবে 'ছিলকা' নামে পরিচিত তার উল্লেখ করেও প্রবন্ধকার লুপ্তপ্রায় নিদর্শনকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন বলা যায়। যেমন 'ইলিশ মাছের সাধু / ঝিলমিল কাটা / মইল্যাম মইল্যাম সাধু / দুই সাতিনির ঝাটা(পৃ.৭৯)' অথবা ' ওংপুরে নাগিল আগুন / দিনাজপুরে ধুয়া / মহাজনের মাল পুড়া যায় /চ্যাচেয়া মরে চুয়া'(পৃ.৮০) উত্তর প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে পরস্পরকে শ্লেষ বিদ্রুপের বাণে বিদ্ধ করার নিদর্শন। আবার 'অতিবড় ঢাঙা না হই বাতাসে টালায় / অতিবড় নীচা না হই বেঙে ড্যাওয়ায় (পৃ.৮১) এই ছিলকাটির মধ্যে বাংলার চিরকালীন প্রবাদ 'অতিবড় হয়োনা ঝড়েতে পড়িবে / অতি ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়াবে' বক্তব্যরই প্রতিধ্বনি শোন যায়। সন্দেহের কারণ যে, ছড়াগুলির কিছু সংখ্যক মৌলিক হলেও বেশ কিছু সংখ্যক অনুবাদ মাত্র।

গ্রন্থের ৯৫ থেকে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক উত্তরবাংলার বন ও বনৌষধির তালিকা দিয়েছেন ও বনৌষধি কোনটির কোন রোগে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে তার তালিকা দিয়েছেন। তাছাড়া চা বাগানগুলির নাম ও প্রতিষ্ঠা বর্ষের একটি তালিকা দেওয়ায় তা উৎসাহী পাঠকের কৌতূহল নিরসনে সমর্থ হয়েছে বলা যায় (পৃ.৯৯-১০৩)।

তবে গ্রন্থ রচনায় লেখকের সামগ্রিক উৎসাহকে ও গবেষক মনকে স্বীকৃতি দিয়েও বলা যায় যে, এতে বেশ কিছু ত্রুটিও রয়ে গিয়েছে। যেমন প্রথমত গ্রন্থটিতে দুই বাংলার সীমারেখা স্পষ্ট নয়, কেননা মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গ বলতে যে চিত্র ফুটে তাতে রাজনৈতিক সীমারেখা পেরিয়ে উভয় বাংলারই কয়েকটি জেলার নাম স্বাভাবিক ভাবেই আসে। দ্বিতীয়ত উত্তরবঙ্গের জাতিগুলির নাম পরিচিতি ছাড়া নৃতাত্বিক বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়নি। তৃতীয়ত জেলাওয়াড়ী বিভাজন স্পষ্ট না হওয়ায় উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। প্রধাণত কোচবিহারের কথাই মধ্যে পাওয়া যাবে। যেখানে বংশানুক্রমিক তথ্যর পুঞ্জ সেখানে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রূপ দিতে গিয়ে (অর্থাৎ এই, গ্রন্থের দুই নম্বর চিঠি) লেখক তাল রাখতে পারেননি, খানিকটা অস্পষ্টও হয়েছে। এটাকে দুটো চিঠির বিষয় করলে ভালো হতো মনে করি।' বস্তুত ভূমিকা লেখকের এই মন্তব্য সঙ্গত বলেই বনে হয়।

১৯৯৯ সালে রণজিৎ দেবের প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ কোচবিহারের ঐতিহ্যময় রাজপ্রাসাদ প্রথম সংস্করণ পঁচিশ পাতার এমন একটি গ্রন্থ যাতে একুশটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে যাতে কোচবিহার রজ্যের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। অধ্যায়গুলি হল কোচরাজাদের উৎস অনুসন্ধানে কিছু কথা, রাজ্যাভিষেক কাল সহ কোচ রাজন্যবর্গ, কোচবিহারের নামকরণের উৎসকথা, কোচবিহারের ঐতিহ্যময় রাজপ্রাসাদ, সন্ধিপত্র কোচবিহার ও অন্যান্য, এছাড়া অহোমরাজ, কাছাড়ারাজ, মণিপুররাজ, জয়ন্তিরাজ, শ্রীহট্টরাজ, ত্রিপুরারাজ, খাইরমরাজ, দিল্লীশ্বর আকবর, ইশাখাঁ, মানসিংহ, ভুটানরাজ, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে সন্ধিপত্র, তাছাড়া ভুটান ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সাক্ষরিত সন্ধিপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। ২০০০ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার। এতে অতিরিক্ত যে ৬টি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে তাতে স্থানে পেয়েছে পরীক্ষিৎ নারায়ণের সঙ্গে আহোমরাজের, লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহ ও অহোমরাজের, মহারাজ প্রাণনারায়ণের সঙ্গে শায়েস্তা খাঁর ও ১৭৭৩ সালে সাক্ষরিত চুক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তাছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বশেষে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণের রাজ্যাভিষেক থেকে শুরু করে কোচবিহারের ভারতভুক্তি সব তথ্যই সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, এমনকি এই প্রসঙ্গে 'প্রজাহিতসাধনী' সংস্থার ভারতভুক্তির বিরোধীতা এবং সংস্থার কিছু সদস্যর কোচবিহারের পাকিস্তানভুক্তির প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার প্রমাণ হিসাবে তৎকালে প্রচলিত --

'ও মোর ভাইই কুচবিহারী রে
চতুর্দ্দিকে দেখং সবুজ বাতি
তোমরা এলা কেনে আন্ধার রাতি'।

(একটি ঐতিহাসিক চুক্তি - পৃ. ৪০-৪১)

গানটি প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু বিভিন্ন মুদ্রার প্রতিলিপি সহ মোট উণিশটি চিত্রের প্রতিলিপি এখানে স্থান পাওয়ায় ক্ষুদ্রাকার এই গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই।

২০০০ সালে প্রকাশিত রণজিৎ দেবের গ্রন্থ 'কোচবিহার জেলার দেবদেউল' তেত্রিশ পৃষ্ঠার এমন একটি গ্রন্থ যাতে কোচবিহার জেলার মাসিক সাহায্যপ্রাপ্ত ১৭টি ও অন্যান্য ২৬টি, মোট ৪৩ টি মন্দির ও মসজিদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

২০০০ সালে প্রকাশিত রণজিৎ দেবের বাহান্ন পৃষ্ঠার গ্রন্থ ' পত্র সাহিত্যে কোচবিহারের রাজদরবার'এ সাতাশটি অধ্যায়ে কোচবিহারের প্রাচীন ডাকব্যবস্থা সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহারাজা ও প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের লেখা বিভিন্ন পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রগুলির মধ্যে বাংলা গদ্যের নিদর্শন বলে গণ্য মহারাজ নরনারায়ণের পত্র, অহোমরাজ স্বর্গদেব চুকামফার পত্র, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য কোম্পানীর কমিশনারের পত্র, কোচবিহারে আধুনিকতার পথিকৃৎ কর্ণেল হটন, কালিকাদাস দত্ত সুনীতি দেবী, মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণের পত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পত্র, ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব্ ওরিয়েন্টালিস্টস্এর দ্বাদশ অধিবেশনে দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে প্রদত্ত আমন্ত্রণ পত্র উল্লেখযোগ্য।

রমণীমোহন বর্মা

রমণীমোহন বর্মার প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রাজবংশী লোকসাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের দোলযাত্রার দিন। একাশি পৃষ্ঠা বা পাঁচ ফর্মার উপর পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থে অধ্যায় আছে ৭টি।

'রাজবংশী লোকসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিতা' শীর্ষক অধ্যায়ে দেখা যায় স্থানীয় মুসলীম সম্প্রদায়ের একটি বিয়ের গান তুলে ধরেছেন যেখানে বলা হয়েছে 'ঝখন কুমার হলোদি তোলে/ভাবের মাইলান মোর পাসুনের কানি ধরি কান্দে/হামরা থাইকতে সাধু না করেন বিয়াও'(পৃ.২)। বিরহ বেদনার বার্তাবহ এই গানে দেখা যায় প্রেমিক তার পূর্ব প্রেমিকাকে ছেড়ে অন্য কোনও যুবতীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তাই যখন প্রেমিক পাসুন নিয়ে হলুদ তুলতে যায় তখন প্রেমিকা পাসুনের কিনারা ধরে কেঁদে বলে ' হামরা থাইকতে সাধু না করেন বিয়াও'। বস্তুত এই কান্নার মধ্যে দিয়ে সর্বকালের বঞ্চিতা নারীদের কান্নাই ফুটে ওঠে। তবে এই অধ্যায়ে দেখা যায় 'তুমি মারবেন কন্যাহে কন্যা আমার পরাণ হরি/ তুমি হও দরিয়া কন্যা আমি তাতে ডুবে মরি হে'. এই গানটির সাথে ময়মনসিংহ গীতিকার'কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা,/ কোথায় পাইবাম দড়ি/তুমি হও গহীন গাঙ/আমি ডুব্যা মরি' সাথে মিলের কথা যত সহজে বলতে লেখক পেরেছেন ততটা অন্য একটি গানের বেলায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেননি। যেমন ' কিসের মোর রাধন কিসের মোর বাড়ন/ কিসের মোর হলদি বাটা/ মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ী যায়/ মোর আঙিনা দিয়া ঘাটা'(পৃ.৫) এই গানটির সাথে যে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'হেন মতে পরিহাসে সে আন যুবতী লঞা/ কাহ্ন রতি ভুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে' অথবা বৈষ্ণব পদাবলীর 'আমারি বঁধুয়া আন বাড়ী যায়/ আমারি আঙিনা দিয়া' গানটির সাদৃশ্য রয়েছে এটা তিনি সচেষ্ট হলেই জানতে পারতেন, অথচ এটা প্রমাণ করার জন্য জনৈক অধ্যাপকের মুখনিঃসৃত কথার আড়াল গ্রহণ নেহাতইঅপ্রয়োজনীয় ও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয় (পৃ.৫) তবে 'রাজবংশী লোকসাহিত্য' শীর্ষনাম থাকলেও বইটির অধিকাংশ জুড়েই রয়েছে 'গোরখনাথের গান' বা 'হাইচাও'-এর আলোচনা। যেমন পৃ.১৪ থেকে ১৭ এবং পৃ.৩৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত অর্থাৎ গ্রন্থটির এক পঞ্চমাংশেরও অধিক স্থান জুড়ে আছে গোরখনাথের গানের সম্পর্কিত আলোচনা। তবে গোরখনাথের গানের এই অংশটি 'কলাচ্যাপা ধানরে মোর তুলসি সারি সারি/ তাহার নীচে দরবার করে গৌরমান চৌধুরী/রাম বলো ভাই হরি বলো মুকুন্দমুরারি/গোরখনাথের নামে এবার বলো হরি হরি। শুভে' (পৃ.৪৪) বলা বাহুল্যমাত্র ব্রিটিশ বেনিয়াদের প্রতীক গৌরমন চৌধুরীর লুব্ধ দৃষ্টি যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে এখানে সেই প্রার্থনা করা হয়েছে বলে লেখকের মত(পৃ.৪৫)। লেখকের এই বক্তব্যে এটাই অনুমান হয় যে, এই গানটির অধিক প্রচলন হয়ত রংপুর জেলাতেই। কেননা কোচবিহার জেলা দেশীয় সামন্ত রাজার অধীনে তাকায় এখানকার জনগণ 'গৌরমন চৌধুরী' অর্থাৎ ব্রিটিশ শাষণের স্বরূপ সম্পর্কে দশাতঃ সচেতন ছিলেন এটা ভাবা মুস্কিল। তাই পাশের ব্রিটিশ শাষণাধীন রংপুর জেলাতেই হয়ত এই গানের প্রচলন অধিক ছিল। পৃ.৪ এ বর্ণিত গানটি 'পায়ের উপর গঙ্গা যমুনা তরঙ্গি তরঙ্গি চলেরে/ মাথার উপর ফর্কে দেয়া রূপের ঝলকত ঝরে রে' যে ভূতপূর্ব জলপাইগুড়ি জেলা এবং বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার পাটগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত বলে লেখক জানিয়েছেন (পৃ.৪)। তাছাড়া ১৭ নং

পৃষ্ঠায় বর্ণিত ধর্মনারায়ণ সরকার ভক্তিশাস্ত্রী (বাংলাদেশ) প্রণিত 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও ভাষা' গ্রন্থের সূত্র উল্লেখে অনুমান হয় যে, লেখক র‍্যাডক্লীফ সীমারেখার এপার ওপার দুপারেরই লোকসংস্কৃতি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তবে রাজবংশী সমাজের পূজা পার্বন বলতে লেখক এখানে প্রধাণতঃ গোরখনাথ ও মদনকামের পূজার কথাই আলোচনা করেছেন, কিন্তু এর ফলে রাজবংশী সমাজের পূজা পার্বনের সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরতে পারেননি, বিশেষ করে হুদুম দেও ও অন্যান্য পূজা পার্বনের নাম এখানে অনুল্লিখিত। তবে ২৯ পৃষ্ঠায় 'শ্লোক, প্রবাদ, হেঁয়ালি ও মুসলিম পরিবারের প্রভাব' ও ৫৭ পৃষ্ঠায় 'উত্তরবঙ্গে মুসলিম বিয়ে ও তার গানে হিন্দু প্রভাব'-এর আলোচনা সম্প্রদায় বিশেষের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃতি এনেছে বলা চলে। যেমন—

আচ্ছালামো হ্যানে
দুলা আইচ্চে বিয়াও করবার
তোমরা আইচ্চেন ক্যানে?

উত্তর ঃ

আচ্ছালামো হোবা
দুলা আইচ্চে বিয়াও করবার
আমরা আচ্চি শোভা'
(পৃ.৩১)

অর্থাৎ বিয়ের আসরে বরের সঙ্গে লোকেদের কনের সঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করছে যে, বর বিয়ে করতে এসেছে কিন্তু সঙ্গিরা কেন এসেছেন? উত্তরে সঙ্গিরা জানিয়েছে যে, বর বিয়ে করতে এলেও সঙ্গিরা শোভাবর্ধনের জন্যই এসেছে। তবে পৃ.৩৩ এ হেঁয়ালি 'তিন ত্যারো মৈদ্দে বারো/নয় বিয়া মিলোন করো/মোর সোয়ামীর এই নাম/ঘাট পার করি দ্যাও বাড়ী যাইম।' আলোচনা করলে দেখা যায় মহিলা তার স্বামীর নাম স্পষ্টত উচ্চারণ না করে সুকৌশলে জানিয়ে দিয়ে মাঝিকে নদী পার করে দিতে বলল। এখানে আমরা যেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত 'ছদ্মবেশী অন্নদার 'জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী' বলে দ্ব্যার্থবোধক আত্মপরিচয় দিয়ে ঈশ্বরী পাটনীকে নৌকা পার করে দেবার অনুরোধের যেন ছায়াপাত ঘটেছে বলে প্রতীত হয়। ৫৭ নং পৃষ্ঠায় উত্তরবঙ্গে মুসলিম বিয়ে ও তার গানে হিন্দু প্রভাব' শীর্ষক আলোচনায় লেখক মন্তব্য করেছেন 'এই হিন্দু মানুষগুলি যে ধর্মান্তরিত হয়ে হলেন মুসলিম একই মানুষের এই ধর্মটি যদি একটা বিশেষ বাধা হিসাবে ধরেও নিই কিন্তু ঐ ধর্মটুকু বাদ দিলে হিন্দু সংস্কৃতির অবিকল চেহারাটাই রয়ে গেল নবাগত মুসলিমদের মধ্যে। তার বক্তব্যর প্রমাণ হিসাবে ঐ একই পৃষ্ঠাতে তিনি যখন মুসলিম বিয়েতে আলোচনা, পঞ্জিকা দেখা, অধিবাস, চালনি ঘট, কলা সিঁদুর, সাতপাতাযুক্ত আমের ডাল, সরষের তেল, চুনের ফোঁটা এবং আইবৈরাতি বা এয়োস্ত্রীদের অনুষ্ঠানের কথা বলেন তখন শুধু তাঁর বক্তব্যর সত্যতাই প্রতিপন্ন হযনা তাঁর অনুসন্ধিৎষু মনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে ৭৯ পৃষ্ঠায় রাজা কান্তেশ্বর সম্পর্কে তিনি বলেছেন পাঠানদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে হোসেন শাহের দ্বারা কুটকৌশলে বন্দী হলে 'পিতৃতর্পণের অছিলায় কাজলিকুড়া নামক দীঘিতে জলমগ্ন হয়ে আত্মহত্যা করেন'। কিন্তু কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের ৪৭ নং পৃষ্ঠায় খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ লোকশ্রুতি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, রাজা কান্তেশ্বর কাজলীকুড়া সরোবরে স্নানকালে পালিয়েছিলেন এবং তাঁকে যে পিঞ্জরে বন্দী করা হয়েছিল তা যে স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছিল তার বর্তমান নাম 'পিঞ্জরীর ঝাড়'। ঐ একই পৃষ্ঠায় স্যার এডওয়ার্ড গেইটকে উদ্ধৃত করে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ জানিয়েছেন যে, রাজা কান্তেশ্বর বন্দী হয়ে গৌড়ে যাবার সময় পালিয়ে যান ও পরে সৈন্য সংগ্রহ করে হোসেন শাহের পুত্র দানিয়েলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হয়েছিলেন। তবে রাজার পলায়নের ও রণজিৎ দেবের 'উত্তরবঙ্গের চিঠি' গ্রন্থের ২৮নং পৃষ্ঠায় রাজার মৃত্যু ও পলায়ন দুটি লোকশ্রুতিরই উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং রমণীমোহন বর্মার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ইতিহাসানুগ নয়।

তবে গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় লেখকের বক্তব্য 'ভাওয়াইয়া একমাত্র বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু সমাজের নিচুতলার মানুষের ছিল আবসর বিনোদনের মাধ্যম।' এখানে লেখকের বক্তব্য ভাষার বিন্যাসের অভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কারণ ভাওয়াইয়া গানই নিচুতলার মানুষের একমাত্র মাধ্যম ছিল, অন্য কিছু নয়, অথবা ভাওয়াইয়া একমাত্র নিচুতলার মানুষেরই বিনোদন মাধ্যম ছিল তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার সর্বত্রই লোকগীতি বা সংস্কৃতি অব্রাহ্মণ। অর্থাৎ তা শিষ্ট সঙ্গীত বা সংস্কৃতির মত ফরমাইশি নয়, প্রাণের সহজ আবেগেই সৃষ্টি।

সবশেষে বলা যায় গ্রন্থটিতে লেখকের অনুসন্ধিৎসু মন যতই স্পষ্ট হোক সুচারুভাব, গৃহিনীপনা, বিস্তৃতির অভাব বইটিকে পরিপূর্ণতা দিতে পারেনি। তবে উপসংহারে এটা বলা যায় রমণীবাবু রাজবংশী লোকসাহিত্য বলে উদাহরণ সহ যে প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করেছেন তা নিরপেক্ষভাবে রাজবংশী লোকসাহিত্য নয়। রাজবংশী সম্প্রদায় এখানে একটি বড় অংশ হলেও অ-রাজবংশী বহু সম্প্রদায়ও রয়েছে যাদের সমান্তরাল সংস্কৃতিকে রমণীবাবু রাজবংশী সংস্কৃতি অভিধায় অভিহিত করেছেন। আসলে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সর্বসাধারণের সম্পত্তি।

অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাংলা নাট্য ও রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের রূপরেখা' প্রকাশিত হয়েছে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৯৪ সালে। মোট আঠাশ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বইটি বাংলা নাটকের ইতিহাসের ক্ষুদ্রায়ত দর্পন বলা চলে। এতে দেখা যায় লেখক বাংলা নাট্যগীতি বড় চন্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন পর্যন্ত আলোচনা করেছেন। এর অনেক তথ্যই নাট্য শাস্ত্র তথা সাহিত্যের ছাত্রদের জ্ঞাত তবে ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর কলিকাতা ডোমতলা মঞ্চে রুশ পর্যটক গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফের উদ্যোগে অভিনিত প্রথম বাংলা নাটকের বিজ্ঞাপন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য(পৃ.৩)। তবে 'বাংলা নাটকে গণতন্ত্রীকরণ ঃ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ' অধ্যায়ে যখন নীলদর্পন নাটকে রোগ সাহেবের চরিত্রে অভিনয়কারী অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অভিনয়ে স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে বিদ্যাসাগর তাকে চটিজুতা নিক্ষেপ করেন এবং মুস্তাফী মশাই তা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে তুলে নেন তা আবেগবিহ্বলতার দিক থেকে যতই প্রশংসনীয় হোক না দর্শক হিসাবে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা চিহ্ন তোলে একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু দর্শকের অত্যধিক আবেগ সঙ্গত কিনা এবং তা রসভঙ্গ ও নাটকের গতিকে ব্যহত করে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর লেখক দেননি। তবে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা নাটকে নতুন রীতি' অধ্যায়ে 'সরোজিনী' নাটকের বাস্তবদৃশ্য বর্ণনায় যেভাবে মঞ্চে আগুন ঢেলে রাজপুত নারীদের জহরব্রত পালনের বাস্তবদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হত নটী বিনোদিনীর বকলমে লেখক তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাছাড়া ১৮৭৬ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী সরকার প্রণীত নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলে যে সব নাটক নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার তালিকাও উৎসাহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।(পৃ.১৪-১৫) তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যদিও 'রবীন্দ্রনাথ ঃ মঞ্চে ও অভিনয়ে নতুন মাত্রা ও রীতি'(পৃ.২১) শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু আলোচনা করেছেন স্বল্প পরিসরে। অবশ্য প্রায় প্রতিটি প্রসঙ্গই তিনি অতি স্বল্প পরিসরেই আলোচনা করেছেন। তাই আকারে ও প্রকারে এটিকে ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকার মতই মনে হয়। বলা বাহুল্য এটি গবেষণাধর্মী পুস্তক না হলেও বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতই আকাঙ্খা মিটাবে। তবে নাটকের ফর্ম, আঙ্গিক, অভিব্যক্তি সম্পর্কে দর্শকরে কোন আকাঙ্খা এই বইটি থেকে মিটবে না একথা প্রথমেই জেনে রাখা ভাল।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

১৯৯৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছে অমিয়ভূষণ মজুমদারের একশ উনিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'লিখনে কি ঘটে'। এতে এগারটি অধ্যায়ে মোট এগারটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে যাতে জীবন ও সাহিত্যসম্পর্কে লেখকের মননশীল ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি হল 'লিখনে কি ঘটে', 'উপন্যাস সম্বন্ধে', 'উপন্যাসের গল্প', ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন', 'সাহিত্য ও নীতি', 'সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব', 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়', 'সাহিত্যের ধারণা,' 'সংবিত্তি', 'রমণীরত্নের সন্ধানে', 'পদ্মাপুরাণ কথা' ইত্যাদি।

প্রথম প্রবন্ধ 'লিখনে কি ঘটে'তে তিনি সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাবনা অনুসারে সাহিত্য আমাদের অনুভূতি এবং সাহিত্যিক যোগীর মত আমরা কী এবং কেন এই রহস্যকে আত্মস্থ করতে চাই। তাঁর ভাষায় ' ঘুমে মাতৃজঠরের অনুভূতিকে আত্মস্থ করার মতো যোগীও সৃষ্টির আদিম রহস্যের সংলগ্ন হয়ে যায়' (পৃ.৮)। আবার সাহিত্য কল্পনাপ্রসূত হলেও তাঁর বিচারে তা সাহিত্যের একমাত্র লক্ষণ নয়। কেননা অশ্রুত, অননুভূত কোন বস্তু কল্পনায় ধরা দেয়না। আবার সাহিত্য বাস্তবের কারবারী হলেও তা হুবহু ফটোগ্রাফ নয়। তাঁর ভাষায় 'যা সাহিত্যে বিধৃত তা সমাজের পরিবর্তিত রূপ' (পৃ.১১)। আবার সাহিত্যে ইনস্পিরেশনের ভূমিকাকে তিনি শুক্তিতে বালুকণা প্রবেশের সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে করেন।(পৃ.১৩)

উপন্যাস সম্মন্ধে তাঁর মন্তব্য হল উপন্যাস যেহেতু কলা তাই তার সংবেদন থাকবে এবং তাকে প্রথমাবধি বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল ' বাস্তবের বিশ্বাস উৎপাদনের দায় তেমন অনেক সময়ে ঔপন্যাসিক এমনভাবে আবৃত করে যে মনে হবে যে বাস্তবের অনুকৃতিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য' (পৃ.২০)। প্রাবন্ধিকের মন্তব্যে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উপন্যাসের এই ধরণের উদ্দেশ্যের সাথে তিনি সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেন না। আবার এই উপন্যাস সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন, 'বলেছি উপ্যাস এক কালচারড্ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি যে অধুনা গৃহ হারিয়েছে। কালচারড্ বা সংস্কৃতিবান মানুষ তো অন্যসব মানুষের মতোই, যার অভিজ্ঞতা হয়, অনুভূতি হয়, যার আবেগ, বুদ্ধি, চেতনা আছে।' (পৃ.২৭, উপন্যাসের গল্প)। এই অধ্যায়েই তিনি ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিশীল শিল্পীসত্তাকে অধিদৈবত বা স্পিরিট বলে অভিহিত করেছেন (পৃ.৩৫)।

'ঔপন্যাসিক ও জীবন দর্শন' প্রবন্ধে জীবনের স্বরূপনির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'জীবন কী তা সম্যক না বুঝলেও, জীবনের পক্ষে কী কী ভাল তা যেন বুঝতে পারি, তার ফলে যা জীবনের পরিপন্থি, যা জীবনকে সংকীর্ণ করে, জীবনের ক্ষতি করে, জীবনের পরিপোষণ করে না, তাকে আমরা জীবন দর্শন বলি না।' (পৃ.৪২) এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিকের উপন্যাসে ব্যক্ত সজ্ঞান জীবনদর্শন তাদের যথাযথ জীবনদর্শন কিনা সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (পৃ.৪৪) কেননা সজ্ঞান জীবনদর্শন তাঁর মতে উদ্দেশ্যমূলক হয় বলে তা ঔপন্যাসিকের যথাযথ ভাবনার প্রতিফলন নাও হতে পারে। তবে 'সাহিত্য ও নীতি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে প্রবন্ধকার যথাযথভাবেই মন্তব্য করেছেন 'মুসলীম শাসন ব্যবস্থা বা অব্যবস্থাকে উটকো আপদ মনে করতেন তিনি, কিন্তু মুসলীম ও হিন্দু রায়তে বোধ হয় ভেদ করতেন না। হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত, পরাণ মন্ডল তাঁর দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ছিল।'(পৃ.৫৭) 'সাহিত্যিক জীবন মহাশয়' প্রবন্ধে এসে তাঁর প্রতীতি হয়েছে জীবন হল ভাল মন্দ বাস্তব কল্পনা মিশ্রিত একটি গল্প যার কোনটা জমে ওঠে এবং কোনটা ঠাট্টায় পর্যবসিত হয়। তার ভাষায় '.....গল্পটা হারালে জীবন মহাশয়েরও পাত্তা থাকে না' (পৃ.৭৪)।

তবে 'সংবিত্তি' প্রবন্ধে যখন প্রাবন্ধিক বলেন 'আমার তো মনে হয় হায়ার ফিজিক্স যেমন গণ-গ্রাহ্য করা যায়না, সাহিত্যকেও তেমন গণগ্রাহ্য করা যায় না। বৈজ্ঞানিক কী ভাবতে থাকেন এটা কি জনসাধারণ বুঝবে? সাহিত্যিকও সৃষ্টির সময় কী ভাবতে থাকবেন — তা কি গণ-গ্রাহ্য হচ্ছে?' (পৃ.৯০) তখন স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করা সম্ভব হয় না। কেননা পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ লেখাই যে গণ-গ্রাহ্য হয়েছে এই সত্যটি হয়ত প্রাবন্ধিক বিস্মৃত হয়েছেন। তাছাড়া গণ-গ্রাহ্য বলতে হয়ত তিনি সাহিত্যরচনার মানের অবনমন কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু গণ-গ্রাহ্যতা এবং মানের অবনমন কখনই একার্থক নয়।

যাই হোক আলোচনান্তে বলা চলে যে, গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির বক্তব্যর সাথে হয়ত সবাই পরিপূর্ণভাবে একমত পোষণ করবেন না, কিন্তু বিষয়ের গুরুগাম্ভির্য, বলিষ্ঠ শব্দ চয়ন, ভাষার ওজস্বিতা ইত্যাদি বিচারে প্রবন্ধ গ্রন্থটি পাঠককে ভাবনার বলয়ে আবর্তিত করে তাতে সন্দেহ নেই।

দিগ্বিজয় দে সরকার

দিগ্বিজয় দে সরকার এ পর্যন্ত পাঁচটি প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এগুলি হল 'আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ','লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গ,' 'বৈষ্ণবেতর বাংলাকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব', 'কোচবিহারের লোকনাটক'।

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ ' আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ' সাতষট্টি পৃষ্ঠার এমন একটি গ্রন্থ যাকে লেখক ' আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ', 'মাটির টানে রবীন্দ্রনাথ' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব পদাবলী' এই তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশটির পরিচয় যদিও 'আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ' তবু অংশটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নয়, রবীন্দ্রসাহিত্য কিভাবে নির্মমভাবে আক্রান্ত হয়েছে, এমনকি তা অনর্থক শুধু নয়, তাতে সমালোচকের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি করে ব্যক্ত হয়েছে তাও তুলে ধরেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিভাবে এই ব্যাপারে অগ্রণি ভূমিকা গ্রহণ করেন তা লেখকের কলমে ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির

'উড়িসনে রে পায়রা কবি
খোপের ভেতর থাক ঢাকা'
(পৃ.১৪)

ছত্রটি ব্যক্তিগত উষ্মারই পরিচয় বহন করে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মত একজন বিদগ্ধ সমালোচকের এই উষ্মার কারণও তিনি নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে 'রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী সুরেশচন্দ্র তা কখনো বিস্মৃত হননি। তবে অত্যধিক রবীন্দ্রস্তাবকতা তাঁর সহ্য হতো না।' (পৃ.১৮)

'মাটির টানে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধাংশে বঙ্গীয় হিতসাধন মন্ডলীতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ 'এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যাঁর কোলে আমাদের দেশ জন্ম গ্রহণ করছে।' (পৃ.২৭) এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার নবনির্মাণে রবীন্দ্রনাথের মতামত ব্যক্ত করে প্রবন্ধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। পূর্ববঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করতে গিয়ে কিভাবে রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র চাষিদের ঋণভার থেকে মুক্ত করতে নোবল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কৃষি ব্যঙ্ক স্থাপন করেছেন, কখনো আলুর বীজ, কখনো গুটি পোকার চাষ, ধান ভাঙ্গার কল ও ট্রাক্টরের ব্যবহার প্রচলনে উদ্যোগী হয়েছেন এই আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অকাব্যিক বলে মনে হতে পারে। পল্লীবাংলার সাথে এই নিবিড় সংযোগই তাঁর ছোট গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। তাই গোপাল সাহার মেয়ে ও মহেন্দ্রবাবু কিভাবে সমাপ্তির মৃন্ময়ী ও পোষ্টমাস্টারে রূপান্তরিত হয়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনও যে পল্লীবাংলার নবনির্মাণ ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত তাও সমালোচকের কলমে প্রকাশিত হয়েছে।(পৃ.২৯)

প্রবন্ধগ্রন্থের তৃতীয় অংশ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব পদাবলী'তে বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, সীমার মাঝে অসীমের ভাবনাকে, দ্বৈতবাদকে মূর্ত করে তুলেছে তা সমালোচক দেখিয়েছেন। ছিন্নপত্রের পত্র নং ৪৭ থেকে 'বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়' (পৃ.৪২) উদ্ধৃত করে বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা দেখিয়েছেন। 'ভানুসিংহের পদাবলী' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বৈষ্ণব

প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাছাড়াও 'মানসী', 'সোনার তরী', 'শ্যামলী', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি কাব্যেও বৈষ্ণব কাব্যধারার পরোক্ষপ্রভাব লক্ষণীয়। মানসীর 'একাল ও সেকাল', সোনার তরীর 'বর্ষা-যাপন', শ্যামলীর 'স্বপন', কড়ি ও কোমলের 'মথুরা' কবিতায় (পৃ.৫৩-৫৭) বৈষ্ণব সাহিত্যর প্রভাব প্রাবন্ধিক লক্ষ্য করেছেন।

১৩৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লেখকের একশ পাঁচ পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'লোকায়ত দর্পণে উত্তরবঙ্গ' স্বল্প পরিসরে উত্তরবঙ্গের প্রবহমান লৌকিক জীবনধারার পরিচয় বলা সঙ্গত। এগারটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য শব্দভান্ডার, উত্তরবঙ্গের লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও গবেষণা প্রসঙ্গে, উত্তরবঙ্গের বনশ্রী, উত্তরবঙ্গের হেটো কবিতায় সমাজচিত্র, উত্তরবঙ্গের লোকায়ত ধর্ম, কোচবিহারের গ্রাম নামে সমাজচিত্র, উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতির অভিমানীরা, কোচবিহারের দেবউৈল, কোচবিহারের কাত্যায়নীব্রতের গান, লোককবি নিবারণ পন্ডিত ও তাঁর কবিতা, উত্তরবঙ্গের লোক সাহিত্যে নারী ইত্যাদি নিবন্ধ।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন উত্তরবঙ্গের কৃষি সম্পর্কিত, জীবজন্তু ও বস্তুনাম, গ্রাম নাম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত শব্দভান্ডার যেমন নাঙল, আইল, বিলাই , চেকচেকিয়া ইত্যাদির ব্যবহার বিসদৃশ ত নয়ই বরং চর্যাপদ, গোপীচন্দ্রের গান, কৃত্তিবাসী রামায়ন ইত্যাদি মহৎ সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত গ্রাম্যশব্দ যেমন— বেন্টে, গম্ভীরায়, ভবরজঙ্গী, কাকঁলি এইসব সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধতর করেছে। শুধু তাই নয়, 'আইলত ফুটে আইল কাশিয়া দোলাত ফুটে হোলা/বাপ মায়ে বেচেয়া খাইছে সোয়ামী পাগেলা'—এতদঞ্চলে প্রচলিত কন্যাপণ এবং কন্যাপণের লোভে বিকৃতমস্তিষ্কের কাছে কন্যাদানেরও এক অসহায় চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। (পৃ.৭)

'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণে ও গবেষণা প্রসঙ্গে অধ্যায়ে সংক্ষেপে বাঙালীর নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে প্রবন্ধকার অবহেলিত লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ গ্রাম সমীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং সমীক্ষাকারীকে হতে হবে সমাজ-সংস্কৃতি বিজ্ঞানী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার 'উত্তরবঙ্গের হেটো কবিতায় সমাজচিত্র' অংশে কিভাবে বিভিন্ন হাটে প্রচলিত লৌকিকক কবিতায়, যেমন—

'কারো পেটে ভাত মিলে না (২) নেংটি তেনা অস্থিচর্মসার
কি বা বড় কি বা ছোট লাগল চমৎকার।।' (পৃ.২৩)

-এ সমাজিক দুর্দশার নিদারুন চিত্র চিত্রিত হয়েছে। উপেক্ষিত এই কবিতাগুলিও সমাজজীবনের দর্পন হতে পারে তা তাঁর আলোচনায় ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'কোচবিহারের গ্রাম নামে সমাজচিত্র' অংশে কিভাবে বিভিন্ন গ্রাম নাম সমকালীন সমাজের চিত্রকে প্রতিফলিত করে, যেমন— ভরণপোষণের জন্য জমি দেওয়া হয়েছিল বলে গ্রামের নাম 'পেটভাতা চন্দন চৌড়া' ইত্যাদি আলোচনা করেছেন।

তাছাড়া কোচবিহারে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদিপর্বের প্রাণপুরুষ লোককবি নিবারণ পন্ডিত সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর 'জনযুদ্ধের ছড়া', 'জনযুদ্ধের গান' ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এমনকি বাস্তুহারাদের দেশত্যাগের উপর 'বাস্তুহারার মরণ কান্না' থেকে উদ্ধৃতি , যেমন—

'হায়-হায়রে কোম্পানীর আমলে নীল সাহেবগুলি এলো
নীল চাষীদের ঘরে আগুন জ্বালাইল' (পৃ. ৯৩)

এর মাধ্যমে নিবারণ পন্ডিতের লৌকিক কাব্য প্রতিভার পরিচিতিদানের চেষ্টা করেছেন।

'উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যে নারী' অধ্যায়ে ইতুলক্ষ্মী, পাটপূজা ইত্যাদি ব্রতকথা আলোচনার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের নারীর চিরন্তন কল্যাণী মূর্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। (পৃ.৯৯-১০৫)

সবশেষে বলতে হয় বর্তমান প্রজন্মের কাছে উত্তরবঙ্গের লৌকিক জীবনের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য এই গ্রন্থ একটি অভিনব প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। তবে 'কোচবিহারের গ্রাম নামে সমাজচিত্র' ও 'কোচবিহারের দেব-দেউল' অধ্যায়ের আলোচ্যসূচিতে যদি সমগ্র উত্তরবঙ্গই অন্তর্ভুক্ত হত তবে গ্রন্থের পরিসর আরো বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নেই।

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত লেখকের গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' চুয়াত্তর পৃষ্ঠার এমন একটি গ্রন্থ যাতে মোট অধ্যায় হল ষোলটি।

প্রথম অধ্যায় 'চুর্ণক, আখ্যাণক, নকসা, নভেলা, ছোটগল্প, রবীন্দ্রনাথ'এ তিনি বিভিন্ন আলোচনান্তে এই ভাবনায় স্থিত হয়েছেন ' বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের হাতেই লেখা হয়। ছোটগল্প নামটিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া'(পৃ.১০) এবং এও জানিয়েছেন যে, ১৮৯১ খ্রীঃ হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পটিই প্রথম আধুনিক বাংলা ছোটগল্প।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মূল্যায়ণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন 'গল্পগুচ্ছের প্রধান গল্পগুলি ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবপ্রধান। গানের মত এগুলোও বিচিত্র ভাবের বাহক হয়েছে। করুণসঙ্গীতের মূর্ছনার মত একটা ভাবনা প্রবাহ, একটা নিঃসঙ্গতাবোধ রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পের প্রাণ'(পৃ.১৫) অতিথি, পোষ্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভেদরেখা তিনি টেনেছেন এইভাবে (ক) সহজ সরল গ্রামীণ জীবনের গল্প (খ) নাগরিক জীবনের গল্প। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে উদ্ধৃত করে সমালোচক সঙ্গত ভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, গ্রামীণ জীবনের গল্পগুলির মাধুর্য ও সারল্য অনবদ্য, নগরজীবনভিত্তিক গল্পে তথ্যের ভারকে জোর করে সরাতে হচ্ছে।(পৃ.১৫) সময়ের দিক থেকে তার বিচারে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি তিনপ্রকার। এগুলি হল—

প্রথম পর্ব — ১২৯৮-১৩১৮ বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয় পর্ব —১৩২১- ১৩২৪ ''
তৃতীয় পর্ব — ১৩২৫ - ১৩৪০ ''

আবার বিষয় বৈচিত্রের দিক থেকে তাঁর বিচারে গল্পগুলি ছয় প্রকার। এগুলি হল যথাক্রমে—

ব্যক্তি ও প্রকৃতির সম্পর্কমূলক - ছুটি, সুভা, অতিথি, বলাই ইত্যাদি

প্রেমরহস্যমূলক - ত্যাগ, দুরাত্মা, মানভঞ্জন, জয় পরাজয়, মহামায়া, মধ্যবর্তিণী, দালিয়া, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, মাল্যাদান ইত্যাদি

প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্কমূলক - পোষ্টমাস্টার, জীবিত ও মৃত, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ব্যবধান, কাবুলিওয়ালা, মেঘ ও রৌদ্র ইত্যাদি

সমাজ সমস্যামূলক - দেনাপাওনা, অনধিকার প্রবেশ, বিচারক, নামঞ্জুর, সমস্যাপূরণ, ঠাকুরদা, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র ইত্যাদি

অতিপ্রাকৃত পরিবেশমূলক - কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, গুপ্তধন, নিশীথে ইত্যাদি

কৌতুক ও বিদ্রুপাত্মক গল্প - মুক্তির উপায়, একটি আষাঢ়ে গল্প, ইচ্ছাপূরণ, দর্পহরণ ইত্যাদি

এরপর বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির ভূমিকা পাত্রপাত্রী নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতহীনতা, অতিপ্রাকৃতিক গল্পগুলির অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশ যে মনস্তত্বসম্মত সেই এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পে উত্তরবঙ্গের উপস্থিতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি দালিয়া গল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসমালোচক প্রমথনাথ বিশীর অভিযোগ কাহিনীর মধ্যে যেসব সম্ভাবনা ছিল সেগুলির পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করা হয় নাই, ফলে গল্পটির উপসংহার অকালে আসিয়া পড়িয়াছে।'(পৃ.৬১) এর সাথে একমত হতে পারেননি। বরং তার মন্তব্য হল ' এই গল্পটিও রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম ভাল গল্প। গল্পে স্থান পেয়েছে রোমান্সের স্বপ্নময় মাধুর্য'।(পৃ.৬১)

বস্তুত গ্রন্থটি ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরার এক সুন্দর প্রচেষ্টা বলা যায়।

১৩৯৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৮৯ খ্রীঃ প্রকাশিত দিগ্বিজয় দে সরকারের গ্রন্থ 'বৈষ্ণবেতর বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব' দুইশত ত্রিশ পৃষ্ঠার এমন একটি গ্রন্থ যাতে মোট অধ্যায় আছে পনেরটি। এই গ্রন্থে লেখক প্রথম

তিনটি অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় লীলার উৎস, বৈষ্ণবীয় ধ্যানধারনার স্বরূপ, বৈষ্ণব কাব্যের ভিত্তিভূমি, বৈষ্ণব কবিতার ভাবকল্পনা ও রূপারতি ইত্যাদি আলোচনা করার পর বৈষ্ণবেতর বিভিন্ন কাব্য, যেমন:— অনুদিত রামায়ন ও মহাভারতে, মঙ্গল কাব্যে, মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের সৃষ্ট লৌকিক প্রণয় কাব্যে, শাক্ত পদাবলী, গীতিকা, লোকগীতি, বাউলগান, আধুনিক ক্ল্যাসিক কাব্যরীতি, মধুসূদনের কাব্য, আধুনিক গীতিকবিতা, রবীন্দ্র কাব্য এবং পরবর্তী অন্যান্য কবিদের কবিতায় কিভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করেছেন।

যেমন মহাভারতের ৮৯০ পৃ. বর্ণিত --

'হরিনাম স্মরণ করয়ে যেইজন।
হরিপূজা করে হরি মন্দির মাধুর্য।।'

অথবা বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের ৪০১ পৃ. বর্ণিত —

'বেউলা বলে হরি হরি গোপাল গোবিন্দ।'

অথবা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ৩৭৮ পৃ. বর্ণিত—

'প্রতিবাড়ি দেবস্থান বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরি সংকীর্তন।'

বৈষ্ণবীয় প্রভাব কিভাবে বহুদূর ব্যপ্ত তা প্রমাণ করে।

এমনকি অ-বৈষ্ণবীয় কাব্যধারা বলে পরিচিত শাক্তপদাবলীতেও যখন রামপ্রসাদকে গাইতে শোনা যায়—

'ও মন তোর ভ্রম গেল না,
পেয়ে শক্তি তত্ত্ব হয়ে মত্ত
হরিহর তোর এক হলো না।'

তখন বৈষ্ণবকাব্যধারার ব্যাপক প্রভাব দৃষ্টিগোচর না হয়ে যায় না। মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত ঝুমুর গানেও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন—

'কালার গুণের কথা
বলব তোরে কিতা
বলব কি বল আর তোরে
জলকে যাই ছল করে।' (পৃ.১০২)

এমনকি সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে রচিত কবিগায়কদের মাইকেল মধুসূদন কবিওয়ালা বলেছেন তাদের গানেও 'কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি/বলে কি জানাব তোমায়, তুমি কি জানা দূতি'। (পৃ. ১২১) বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের চিহ্ন বহন করে।

লেখকের আলোচনায় প্রমাণিত পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, এমনকি রবীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব পদাবলী দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল, অন্নদাশঙ্কর সবাই বিভিন্ন সময়ে গভীরভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তা তিনি আলোচনা করেছেন। সমগ্র গ্রন্থটি বাংলা কাব্যধারায় বৈষ্ণব প্রভাবের এক অনবদ্য দলিল বলা চলে।

১৯৯৭ খ্রীঃ লেখকের প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'কোচবিহারের লোকনাটক'এ বিশ্বকেতু- চন্দ্রাবলী পালা, চোখাঠক, বসুন্ধরা বিবি বা সাত সতীনের পালা, দুবলাবালী, রাবানপালা ঃ লক্ষণের শক্তিশেল পালা, বিষহরা বা সতী বেহুলা পালা ইত্যাদি লোকনাটকগুলি সঙ্কলিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায় ' কোচবিহারের লোকনাটক' ঃ প্রাককথন পর্যায়ে তিনি কোচবিহারের লোকনাটককে কুষাণ ও দোতরা এই দুই ধারায় বিভক্ত করার পর পালাগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। এগুলি হল ক) দোতরা ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক পালা, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক, বাহক এবং এইগুলির কোন লিখিত রূপ নেই। খ) এইসব লোকনাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি হল আসর বৈশিষ্ট্য, আলোর বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীত , নৃত্য, অভিনয় কলা। গ) আগে মূল কুষাণ নায়কের গলায় নামাবলী, অনত্র উত্তরীয় থাকত এবং মূল নিজেই পালাটি বিবৃত করত। তবে বর্তমানে যাত্রার অনুকরণে চরিত্রাভিনেতার আগমন ঘটেছে। ঘ) লোকনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট হল লোক সাংবাদিকতা, ঙ) সংলাপের ভাষার মাধ্যম হল স্থানীয় উপভাষা। চ) ব্রেখট নির্দেশিত 'বিচ্ছিন্নতা' লোকনাটকে বহুদিন ধরেই প্রচলিত, ফলতঃ তা আমাদের নিতে পারে সত্য ও বাস্তবের সবুজ প্রান্তরে, ছ) প্রচলিত প্রবাদগুলি ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয় এইসব নাটকে, জ) নাটকগুলি গণশিক্ষার মাধ্যম।

যাই হোক সামগ্রিকভাবে আলোচনায় বলা যায় সার্বিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনান্তে লেখক কোচবিহারের লোকনাটকগুলি মুদ্রিত করে যেমন এইগুলিকে নিশ্চিত অবলুপ্তি থেকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তেমনি নবীন প্রজন্মকে হারিয়ে যাওয়া রত্নরাজি, যেগুলি আপন মহিমায় উজ্জ্বল, তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

ডঃ শচীন্দ্রনাথ রায়

১৯৯৯ খ্রীঃ ডঃ শচীন্দ্রনাথ রায় প্রকাশ করেছেন তাঁর ২৪০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ ' সাহিত্য সাধনায় রাজন্যশাসিত কোচবিহার'। সমগ্র গ্রন্থে উপসংহার সহ মোট অধ্যায় আছে পাঁচটি। প্রথম অধায়ে প্রবন্ধকার কোচরাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, রাজন্যবর্গ ও প্রজাদের ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য, ভাষা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি এতদঞ্চলের সাহিত্যচর্চার অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কামতায় সাহিত্যচর্চার সূচনা, রাজপৃষ্ঠ পোষণার বিশিষ্টতা, কোচশাসনাধীন সাহিত্যচর্চা, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও কোচবিহার, অনুবাদ সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, মৌলিক রচনাবলী, মঙ্গলকাব্য, বরগীত, নাট, কবিত্বশক্তির বিচার ইত্যাদি।

'কামতায় সাহিত্যচর্চার সূচনা' (পৃ.৫০-৫২) পর্যায়ে তিনি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন যে, মধ্যযুগের অসমীয়া সাহিত্য বলে যা পরিচিত তা আসলে বাংলা ও আসামের যৌথ উত্তরাধিকার। কবিরত্ন সরস্বতী 'জয়দ্রথবধ' কাব্যের কৈলাশ বর্ণনার অংশ —

'নানা ঋষিগণে অতিশুদ্ধমনে জানে তত্ববন্দসার
অতি দীর্ঘকায় শিষ্যকপড়ায়ে মধুর শুনি সুস্বর।।' (পৃ.৫২)

উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কোচ শাসনাধীন কামতার সাহিত্য জগতের খ্যাত ব্যক্তিত্ব পীতাম্বর, শঙ্করদেব, অনন্তকন্দলী, রামসরস্বতী, মাধবদেবের কাব্যধারা সম্পর্কেও প্রাবন্ধিক একই অভিমত পোষণ করেছেন।

'রাজন্যবর্গ ও রাজান্তপুরিকাদের সাহিত্যচর্চা' (পৃ.৬২) শীর্ষক আলোচনাপর্বে তিনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ, মহারানী বৃন্দেশ্বরী, মহারানী সুনীতি দেবী, নিরুপমা দেবী ইত্যাদির সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । (পৃ. ৬২-৮৩)

'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও কোচবিহার' শীর্ষক অধ্যায়ে কোচবিহারের অনুবাদ সাহিত্যের ধারা, মঙ্গলকাব্যের ধারা, বৈষ্ণবপদসাহিত্য রচনার ধারা, সাধন সঙ্গীতের ধারা ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায় এখানকার মঙ্গলকাব্যগুলির যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেগুলি হল ক) এখানকার আদিম দেবদেবীরা পুরাণের দেবদেবীর পর্যায়ে উন্নিত হয়ে উচ্চবর্ণের অরাধ্য হতে পারেনি। খ) নারায়ণ দেব রচিত মনসামঙ্গল এখানে অধিক জনপ্রিয় হওয়ায় আর কোন মনসামঙ্গল রচয়িতার আবির্ভাব হয়নি। কোচবিহারের 'গোসানীমঙ্গল' নামে কাব্য হলেও আসলে তা আখ্যানকাব্য। গ) কোচ শাসনাধীন কামতায় বৈষ্ণব ভাবধারার

প্রাচুর্য থাকা সত্বেও এখানে বাংলার অন্য অঞ্চলের বৈষ্ণব পদাবলীর মত উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়নি যা তার বিচারে বিস্ময়কর।'কানাই ধামালী'তে রাধার উল্লেখ থাকলেও তার মতে এটি নিছক গ্রাম্য প্রণয় গীতিমাত্র।

অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের অভিমত হল কোচরাজত্বে রামায়ণের অনুবাদগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। বৈশিষ্ট্যগুলি হল ক) সারানুবাদ বা ভাবানুবাদ যেমন আছে তেমনি আছে আক্ষরিক অনুবাদ। মূল বহির্ভূত বিষয়ের সংযোজনও অল্পবিস্তর ঘটেছে। খ) ষোড়শ শতকের কবিদের চেয়ে উনিশ শতকের কবিরা অনেক বেশি নিষ্ঠা সহকারে মূলকে অনুসরণ করেছেন। মূলাতিরিক্ত ঘটনার সমাবেশ কোনো অনৌচিত্যবোধ সৃষ্টি করেনি। গ) সমকালীন যুগচেতনা সম্বন্ধে কবিরা সচেতন ছিলেন। ঘ) যৌথ প্রয়াসে অনুবাদ কার্য দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়াস নিয়ে কবিরা সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন' (পৃ. ১২৭-১২৮)।

চতুর্থ পর্যায়ে 'লোক-সাহিত্যকথা' প্রসঙ্গে তিনি এতদঞ্চলের ব্রতকথা, হুদুম দ্যাও পূজা, বিভিন্ন লোক সঙ্গীত , যেমন— গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান ময়নামতীর গান, সোনারায়ের গান, পালাগান, কুষাণ, ভাওয়াইয়া দোতরা গান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (পৃ. ১৯১-২৩৪)।

এখানে বলা যায় যে, রাজন্যশাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সাধনায় ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলেও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে উদ্ভূত লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করায় গ্রন্থটি ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে, রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে যে সমান্তরাল নাগরিক জনদের রচিত সাহিত্যর ধারা গড়ে উঠেছিল তা আলোচনা করলে রচনা পরিপূর্ণতা লাভ করত তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই গ্রন্থে প্রবন্ধকার কোচবিহারের স্বাধীনতাপূর্ব যুগের সাহিত্যপ্রচেষ্টার যে ছবি মননশীলতার সাথে তুলে ধরেছেন তা প্রশংসনীয়।

অরুণেশ ঘোষ

১৯৯৮ সালে অরুণেশ ঘোষ প্রকাশ করেছেন তাঁর পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'জীবনানন্দ', গ্রন্থের মুখবন্ধ 'অভিশপ্ত জীবনানন্দ' শিরোনামে তিনি বলেছেন ' সৃষ্টিশীল মানুষ হলেই অভিশপ্ত হতে হবে—এই নিয়ম সভ্যতার শুরু থেকেই উদ্ভব হয়েছিল।'(পৃ.।।।) আর যেহেতু জীবনানন্দ সৃষ্টিশীল তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই অভিশপ্ত। ব্রাহ্ম পরিবারসম্ভূত হওয়ার কারণে তিনি জীবনানন্দের মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্রণ দেখতে পেয়েছেন এবং জীবনানন্দের গদ্য শৈলীতে 'অভিশাপের বিচ্ছিন্নতার মূল অন্বেষণের দিকটা রয়েছে'।(পৃ.৫) মোট অধ্যায়ে তিনি জীবনানন্দের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে 'আমি যেভাবে জীবনানন্দকে দেখেছি'তে তিনি কোচবিহারের প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে কিভাবে জীবনানন্দের সাহিত্যর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ' আমার একটি জীবনদৃষ্টি জীবনানন্দ পড়ার আগেই অস্পষ্টভাবে হলেও পড়ে উঠেছিল, জীবনানন্দে এসে তা স্পষ্ট হল' (পৃ.১০)

সমগ্র গ্রন্থে জীবনানন্দের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'কী যে পরিহাস সময় তথা মহাকালের, যারা ভাবল অমরত্ব তাদের করায়ত্ব, ভাবল সৃষ্টি করে গেলাম মহৎ কবিতা-তারাই আজ বিস্মৃতির পথে'(পৃ.৫৪। আর জীবনানন্দ 'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ' (পৃ.৫৪) বলা সত্বেও অমর। তার মূল্যায়ণে জীবনানন্দ হলেন সমগ্র অরব অন্ধকারের চক্ষুষ্মান, শব্দময়, বাঙ্ময় সন্তান। (পৃ.৫৫) আবার কখনো তিনি বলেছেন জীবনানন্দ স্যুররিয়ালিস্ট না প্রতীকী, ইতিহাস সমাজ চেতনার অথবা নিশ্চেতনার বার্তাবহ কিনা এসবের চাইতে তাঁর অমানবিক পরিহাস, রহস্যময় মানব নিয়তির অবিরাম বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের নিঃস্ব আলোই তার কাছে অনেক প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। যদিও টিনের চালার ভিতরে খাটের উপর নারীপুরুষের নির্মম সঙ্গমচিত্র জীবনানন্দের কবিতার 'বিপরীত, দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা রূপসীর সাথে এক' (পৃ. ৪৪) চিত্রের সাথে প্রাসঙ্গিকতা বোধগম্য নয়।

বস্তুত সমগ্র গ্রন্থটি জীবনানন্দের ব্যাতিক্রমি মূল্যায়ণের কথা বলা সত্বেও কিছু যৌন শব্দের ব্যবহার,

যেমন 'গরিলার মত তার কাঁধ, গাভর্তি রোম, হাতের থাবায় তাকে পিষে ফেলতে চায়, তার স্তন' (পৃ.৪৪) ছাড়া জীবনানন্দ সম্পর্কে প্রচলিত সমালোচনার বাইরে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেননি।

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল ২০০০ খ্রীঃ প্রকাশ করেছেন তাঁর তিনশ তেত্রিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'ইতিকথায় কোচবিহার'। তেরটি অধ্যায়ে তিনি 'নাম পরিক্রমা', 'কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী', 'কৃষিতে কোচবিহার', 'কোচবিহারে পশুপালন ও পশুচিকিৎসা', 'কোচবিহার জেলায় সমবায় আন্দোলন', 'কোচবিহার পার্ক', 'কোচবিহার রাজ্যে সতীদাহ ব্যবস্থা', 'কোচবিহারের রাজকাহিনী', 'কোচবিহার রাজবাড়ীর অন্দরমহল', 'কোচবিহার রাজদরবারে সাহিত্যচর্চা', 'কোচবিহারের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'কোচবিহারের দেবদেউল' ইত্যাদি অধ্যায়ে কোচবিহার নামের উৎপত্তি, রাজধানী সংস্থাপন, কোচবিহারের নদনদীর উৎস ও গতিপথ নির্ণয়, রাজবংশ পরিচিতি, রাজদরবারে সাহিত্যচর্চা, দেবদেউল পরিচিতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, সব আলোচনাই তিনি সংক্ষেপে করেছেন। কিন্তু যে প্রসঙ্গগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল 'কোচবিহার রজ্যের রাজধানী' (পৃ.১৪-১৮) প্রসঙ্গে কোচবিহারের নগরায়ণ প্রসঙ্গ, মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ (পৃ.৭৫-৭৬) প্রসঙ্গে নৃপেন্দ্র নারায়ণ ও সুনীতি দেবীর বিবাহ এবং রাজ্যের আধুনিকীকরণে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তার সভাসদদের ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা, মাহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারাণ (পৃ.৭৭) প্রসঙ্গে ভারতভুক্তির সময় মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ, মহারানী ইন্দিরা দেবী, হিতসাধনীসভা, State Peoples Con-

কমিউনিষ্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের ভূমিকা যা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল তা আলোচিত হয়নি। এমনকি ১৮৭০ সালে খাগড়াবাড়িতে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের বহির্বাটিতে প্রথম উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধন যা বঙ্গীয় নাট্যইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলষ্টোন সে প্রসঙ্গ আলোচিতই হয়নি। ফলতঃ এই গ্রন্থটিকে কোচবিহার রাজ্য সম্পর্কে একটি সাধারন পরিচিতিদানের প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

জবা দে সরকার

১৯৯৭ সালে জবা দে সরকার প্রকাশ করেছেন তাঁর আটাত্তর পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'স্বপন পসারী পরিক্রমা'। কবি মোহিতলাল মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন পসারী' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমালোচকের মতে মোহিতলালের রোমান্টিক কবিস্বভাব, প্রকৃতিপ্রীতি, ভোগবাদ ও বলিষ্ঠজীবন দর্শন স্থান পেয়েছে কাব্যে। কবি রূপ সাগরে ডুব দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে রূপসুধা পান করেন। তাই তিনি বলেন

'আমি মদনের রচিনু দেউল্-দেহের দেহলী পরে,
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচফুল সাজাইনু থরে থরে'। (পৃ.৭)

মোহিতলাল যদিও ঘোষিতভাবে রোমান্টিকতা বিরোধী ছিলেন তবু কাব্যের আঙিনায় প্রধানত স্বপন পসারী বলে রোমান্টিকতাকে নিজের অজ্ঞাতেই আশ্রয় করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

'দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা—
ফুলে পুলে যেথা অতিচুপিসারে
বিলাসিছে পরীবালা।' (পৃ.৭)

'ভ্রান্তবিলাস', কবিতায় রাধা ও কৃষ্ণের যুগযুগান্তের বিচ্ছেদের দীর্ঘশ্বাসই যেন ধ্বনিত হয়েছে তার অভিমত। আবার জাতীয় ইতিহাস ও পুরাকাহিনী থেকে ইঙ্গিত গ্রহণের মাধ্যমে মোহিতলাল বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন এ সত্যও তার আলোচনায় আভাষিত হয়েছে। যেমন 'নাদির শাহের শেষ', 'পুরুরবা', 'উচ্চৈঃশ্রবা', 'শেষ শয্যায় নুরজাহান' উল্লেখ্য। 'নাদির শাহের শেষ' কবিতায় তাই কবিকে বলতে শোনা যায়—

'এই সেই গ্রাম্যপথ

এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মসনদ'। (পৃ.১০)

আবার 'শেষ শয্যায় নুরজাহান' কবিতায় দেখা যায় জীবনের অন্তিম লগ্নে এসেও জাহাঙ্গির ঘরণী নুরজাহানের মনের গহনে প্রথম স্বামীর প্রেমের অমলিন স্মৃতি। ফলতঃ ইতিহাসের ঘটনা যেন হয়ে ওঠে এক অন্তিম রাগিনীর মূর্চ্ছনা। আবার 'পুরুরবা' কবিতায় যখন কবি বলেন—

'সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা
স্থির দীপ্ত সৌদামিনী প্রখর ভাস্বর
দীর্ঘায়ত অতর্কিত খনিস্বর্ণ হতে
ভরিল পাদপস্থলী.... (পৃ.১৭)

তখন কবির নিসর্গপ্রীতির গভীরতাই যেন আভাষিত হয়। আলোচনান্তে বলা যায় 'আলোচনা' ও 'অন্তরঙ্গ পাঠ' এই বিভাগে সাতটি করে মোট চোদ্দটি অধ্যায়ে লেখিকা সমালোচক মোহিতলাল নন, একটি মাত্র গ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে কবি মোহিতলালের কবিসত্বার বহুমুখী দিক উন্মোচন করেছেন।

হিতেন নাগ

১৯৯৮ সালে হিতেন নাগ প্রকাশ করেছেন তার বিরানব্বই পৃষ্ঠার প্রবন্ধগ্রন্থ 'উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান'। এর মধ্যে চুরাশি পৃষ্ঠায় লেখকের নিজের মতবাদ বর্ণিত হয়েছে। শেষ ছয় পৃষ্ঠায় ভাওয়াইয়া গানের উপর সুখবিলাস বর্মার মন্তব্যর অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায় 'কাল নির্ণয় উদ্ভব এবং নামকরণ' এ

'সারিন্দা বাজায় সাউদ সওদাগর
বাঁশি বাজায় চোর
ব্যানা বাজায় ত্যানা পিন্দা
দোতরা হারামখোর।'

শ্লোক উদ্ধৃত করে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের উদ্ভব কাল পঞ্চদশ শতক বলে অনুমান করেছেন এবং গ্রন্থের আলোচনায় লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাওয়াইয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য 'যদিও ভাওয়াইয়া গান প্রেমের গান এবং বাংলার প্রেমের গানের নায়ক নায়িকা মাত্রই রাধাকৃষ্ণ তথাপি একমাত্র ভাওয়াইয়া গানই তাহার ব্যতিক্রম'। (পৃ.৫) এবং '..... সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ঐতিহ্য একদিন উত্তরবাংলায়ও প্রচলিত ছিল এমন মনে করা যাইতে পারে।' (পৃ.৬) এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৯ নং পৃষ্ঠায় তিনি ভাওয়াইয়া নামকরণের উৎস খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং সবশেষে 'বওয়াইয়া' শব্দ থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে এই সিদ্ধান্তে স্থিত হয়েছেন।

প্রসঙ্গ গীতিকা (Ballad) ঃ 'পূর্ববঙ্গ বনাম উত্তরবঙ্গ' (পৃ.১৩-১৫) ভাওয়াইয়া গানের দেশে গীতিকার দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন এবং গীতিকা সচেতন ও শিক্ষিত কবিমনের সৃষ্টি এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে এখানের মাটিতে গীতিকার দুর্ভিক্ষের কারণের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া উত্তরবাংলায় পালা গানের সাময়িক বন্ধাত্বের কারণ হিসেবে ১৯০২ সালে রংপুর শহরে শুরু শওয়া 'সরদারী আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছেন।

'ভাওয়াইয়ার নায়িকা বনাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা' (পৃ. ২৪-৩৫) অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকা এবং ভাওয়াইয়ার নায়িকার সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে তিনি উদ্ধৃত করেছেন

'ওকি দাদারে যৈবন দেখিয়া ছাতি মোর ফাটে
.....
কতকাল রাখিব ঢাকি শাড়ির অঞ্চল দিয়ারে'।

(ভাওয়াইয়া, পৃ. ২৭, উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান)

এবং

'এবে ঘুস ঘুসাঞা পোড়ে তোর মন
পোটলি বান্ধিয়া রাখ নন্দুলি যৌবন।'

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধা বিরহ খন্ড, পৃ. ২৭, উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান)

লক্ষণীয় সময়ের প্রেক্ষিতে ভাষারূপের ভিন্নতা থাকলে ও দুই গানের বক্তব্যর বিষয় একার্থক। তাছাড়া দুই গানেই নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। (পৃ. ২৭)

আবার পরকীয়া প্রেম প্রসঙ্গে ভাওয়াইয়া গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্য প্রসঙ্গে তার উদ্ধৃতি —

'মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায়
মোর আঙ্গিনা দিয়া ঘাটা'
ও প্রাণ সজনী! কার সঙ্গে কব দুক্কের কথা।'

(ভাওয়াইয়া, পৃ. ৩১, উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান)

এবং

'সখী কি আর কহিব দুঃখের কথা
আমার বধূয়া আন বাড়ি যায়
আমারই আঙ্গিনা দিয়া'।

(বৈষ্ণব পদাবলী, পৃ. ৩১, উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান)

নিশ্চিতভাবেই কালের বাধা অতিক্রম করে দুই ধরনের গানের সাদৃশ্য প্রমাণ করে। এছাড়া 'ভাওয়া গানের পাখি' (পৃ.৩৬-৪৮) প্রসঙ্গে ভাওয়াইয়া গানে বিভিন্ন পাখি ভাওয়াইয়া গানের গায়কদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা প্রবন্ধকার আলোচনা করেছেন।

সবশেষে বলা যায় প্রবন্ধকার এতদঞ্চলের লোকসংগীতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভাওয়াইয়া প্রসঙ্গ আলোচনা করে তার উৎপত্তি ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। যদিও সবশেষে পৃথকভাবে সুখবিলাস বর্মার মন্তব্যর পুনরুক্তি প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে মৌলিকত্বের পরিচয়বাহী নয়, তবে এটি তার অধ্যয়ন ও মননের পরিচয়বাহী বলা যায়।

ভ্রমণ সাহিত্য

পর্য্যটকের চোখে পশ্চিম জার্মানী ও হল্যান্ড

সতীশ চন্দ্র পাল

সতীশ চন্দ্র পাল ১৯৭৮ সালের ১৫ই আগষ্ট তাঁর আত্মীয়ার আহ্বানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তদানিন্তন পশ্চিম জার্মানী ও হল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ৫৩ দিন পশ্চিম জার্মানী ও ৩ দিন হল্যান্ড মোট ৫৬ দিনের এই ভ্রমণে বিলেফেল্ডকে কেন্দ্রকরে পশ্চিম জার্মানীতে ৭৪০০ কি:মি: ও হল্যান্ডে ১৫০০ কি: মি: মোটরে পরিভ্রমন করেছেন। সমগ্র ভ্রমন কাহিনীটি তিনি সন ও তারিখ দিয়ে দিনলিপির মত বর্ণনা করেছেন এবং মাঝে মাঝে নিজের পর্যবেক্ষণকেও ব্যক্ত করেছেন। জার্মান মহিলা ক্রিষ্টেলের সঙ্গে কিভাবে আত্মীয়তা সূত্রে তাদের ভ্রমন সম্ভব হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর পূর্ব দক্ষিনাংশের পশ্চিম বার্লিন,মিউনিক, ষ্টুটগার্ট রাজধানী শহর বন ও বৃহত্তম বিমান বন্দর ফ্রাঙ্কফুর্টেও যেতে পারেননি ফলে জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র গুলি তাঁদেখা থাকায় তার পর্য্যবেক্ষণ অনেকটাই অসম্পূর্ণ বলতে দ্বিধা নেই। (সূত্র পরিশিষ্ট পৃ-১৯০) তবে বর্ণনার শেষাংশে এই দুইদেশের প্রশংসনীয় যে জিনিষগুলি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন বিমান বন্দরে কুলি সমস্যা ও গৃহপরিচারিকা বিষয়কতথ্য, পথঘাট, পানীয় জল, গাড়ির মালিকানা, মদ্যপান, বৈদ্যুতিক আলোর প্রাচুর্য্য, কর্মব্যস্ততা, বিনোদন, অপরাধ যাননিয়ন্ত্রন, ফসল, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, খাদ্যবস্তু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বীমা ও আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য (পৃ ১৮৬-১৮৯) তবে লক্ষনীয়,সেখানকার জীবনযাত্রার উজ্জ্বল দিকটিই তার চোখে পড়েছে সেখানে জনজীবনের ক্ষোভ, রাষ্ট্রীয় সত্তার খর্বিকরনে হতাশ,ফোশিবাদীশক্তির মৃদু উত্থান, মিত্র শক্তির নিকট জার্মান জাতীয় ও রাষ্ট্রীক অস্তিত্বর খর্ব হয়ে থাকা ইত্যাদি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে হয়ত স্বল্প সময়ে এর চেয়ে বেশি কিছু জানার সুযোগ তাঁর হয়নি। এই সমগ্র কাহিনীটি পরিচালিত লেখকের দৃষ্টিতে দর্শনে পর্যবসিত হয়েছে

তবে গ্রন্থকারের 'ভূমিকা' থেকে জানা যায় পশ্চিম জার্মানীতে বসবাসকারী ক্রিষ্টেল যার আমন্ত্রনে তাঁরা ঐ দেশে গিয়েছিলেন, তার স্বামী বলরাম দাস, যিনি সম্পর্কসূত্রে গ্রন্থকারের পিসতুতো দাদার সন্তান, বিদেশে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভার্থে নিজেদের জমিবন্ধক দিয়ে তার হাতে ১০,০০০ টাকা দান করেন তা বর্তমান অবক্ষয় ও চিলেচালা বন্ধনের যুগে নতুন করে ভাবার প্রেরণা যোগায়(পৃ ৭ - ভূমিকা)

যাইহোক এই রোজনামচাটিকে সাহিত্য পদবাচ্যবলা যাবে না কেননা যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ভাষারপেলবতা কোন রচনাকে সাহিত্যগুনমন্ডিত করে তোলে তার ছাপ এই গ্রন্থের কোথাও নেই তবে উৎসাহী পাঠকের কিছু পরিমানেহলেও কৌতূহলের নিবৃত্তি যে এই গ্রন্থের দ্বারা চরিতার্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই

কড়চা

কাঠ বাঙালের কড়চা
সুবোধ তালুকদার

সুবোধ তালুকদার রচিত 'কাঠ বাঙালের কড়চা' ১৫৮পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থ যাতে রয়েছে লেখকের ভাষায় বিচিত্র এক জীবনের উপভোগ্য কিছু আখ্যান। প্রকৃত কথায় 'আমারই দুরন্ত ছুটিবেলা', বেহিসাবি মধ্যবেলা এবং প্রৌঢ়ত্বের মজা, দুঃসাহসিকতা ও বেদনার ঘটনা নিয়েই লেখা হয়েছে এই কড়চা (জানাবার কথা)।

বস্তুত ১৯৫ গ্রন্থটিতে রয়েছে লেখকের শৈশব, তাঁরপ্রিয় জন্মশহর দিনহাটার খুটিনাটি স্মৃতি, যুবক বয়সের কলেজেপড়াশুনোর মজাদার এবং বেদনাদায়ক ঘটনাবলী, শহর কোচবিহার, সরকারি দপ্তরে কর্মপ্রাপ্তি, ইতিমধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরডিগ্রীলাভ, পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজে চাকুরির সুবাদে ডঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীলাভ, অবসর ইত্যাদি ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি বৈঠকি চংয়ে, কখনো বা রৈ রৈ ঢংয়ের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যদিও লেখকনামকরণ করেছেন 'কাঠ বাঙালের কড়চা' তবে সেই নামের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ 'কাঠ বাঙাল' মানে যারভাব ভঙ্গিতে জীবনাচরণে পূর্ববঙ্গের স্মৃতি, অভ্যাস গভীরতর ছাপ ফেলে। সেই হিসাবে লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর উদ্ভবের জন্ম 'দাশ' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে হলেও তাঁর জন্মস্থল দিনহাটা শহরেই। ডাকাতির ভয়ে ও ভাগ্যান্বেষনের কারণেই তাঁর পিতার দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে আগমন। পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে লেখকের কোন মোহই যে ছিল না শৈশবে প্রথম পূর্ববঙ্গ দেখতে যাওয়ার স্মৃতিকে উপলক্ষ্যকরে তার স্বদেশোক্তি 'দেশ বলতে ঢাকার এক গ্রাম ছাড়া কপাল' এই নাকি দেশ (পৃ ১৩) এই মনোভাবের কারণ হল চতুর্দিকেরজলময়তা তবে ঢাকা শৈশবে বাল্যকালে লোকসমাগম তাঁকে কিছুটা বিহ্বল করেছিল (পৃ ১৩) তাছাড়া স্টিমারে ভ্রমন, বরিশালশহরের স্মৃতি ইত্যাদি ছাড়া পূর্ববঙ্গ তাঁর জীবনে খুবই গৌন ভূমি অধিকার করে থাকায় 'কাঠ বাঙাল' শব্দের প্রয়োগ যথার্থ নয়। তছাড়াগ্রন্থটির আরএকটি ত্রুটি হল এখানে কোন অধ্যায় নেই। তাই বলা চলে এটি এক নিশ্বাসে বলে যাওয়া স্মৃতিচারণ মাত্র। তবে তাঁরস্মৃতিতে অতীতের দিনহাটা শহর, তার বাসিন্দাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য যা বর্তমানে বিরল ঘটনা বলা যায় তা তুলে ধরতেপেরেছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় দেশকালের দ্রুতগতিতে পরিবর্তন এই গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে স্মৃতি মেদুরতাইএই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা চলে।

চরিত সাহিত্য

"অবধূত নিত্যানন্দ" - অশ্বিনী কুমার সাহা

অশ্বিনী কুমার সাহা রচিত /অবধূত নিত্যানন্দ" ৩১১ পৃষ্ঠার এমন একটি চরিত গ্রন্থ যাতে মোট অধ্যায় আছে ১২টি ও ২টি পরিশিষ্ট অংশ। এই বইটি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যার নাম একসাথে উচ্চারিত হয় সেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভু সম্পর্কে। এতে ১ম অধ্যায়ে নিত্যানন্দের জন্ম থেকে শুরু করে ১২শ অধ্যায়ে অন্ত্যলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল সমগ্র গ্রন্থটিতে আবেশ আছে এমনই শুধু নয়, অতিভক্তি স্বাভাবিক যুক্তি ও বুদ্ধি কে আচ্ছন্ন করেছে। যেমন নিত্যানন্দের বিবাহ - প্রসঙ্গে তার মন্তব্য তিনি কামনার বশবর্তী হয়ে বিয়ে করেননি। যদিও নিত্যানন্দের দুই স্ত্রী বর্তমান ছিল তবু তার সাফাই গাইতে গিয়েলিখেছেন ' নিত্যানন্দের এই বিবাহ আত্মসুখের জন্য নয় বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় একথা ভেবেছিলেন প্রভু '(পৃ - ২৩০) যদিও দুটি নারীকে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ করে যিনি সন্তানের পিতা হন তার বিবাহ একেবারেই কামনা বর্জিত একথা মান কঠিন। সমস্ত গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন

ততঃ স্বধর্ম নিরতানেক গ্রাম নিবাসিনঃ
অভাশতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ
(পৃ - ২৩১)

এর কথা উল্লেখ করা যায়।

সমগ্র গ্রন্থটিতে বক্তব্য রাখা হয়েছে আটপৌরে গল্পের ঢংয়ে। ' আচ্ছা রাজবেশটি কেমন ? লোচন রসায়ন এই রাজবেশ। শির ঝলমল করছে পট্টবস্ত্রের নয়ননন্দন আপীড় ' (পৃ - ১৬২) অথবা ' নদীয়া লীলায় না চাইতেই যিনি মহাপাষন্ডী মাধাইকে ক্ষমাকরেছিলেন তিনি কি আর স্থির থাকতে পারেন এহেন কাকুতি মিনতিতে '(পৃ - ১৬৭)। আসলে গ্রন্থটি যদি লেখক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্তব্যক্তিদের ভক্তির আপ্লুত চিত্তের কথা ভেবে লিখে থাকেন তাহলে কোন বিতর্ক উত্থিত নাও হতে পারে। কিন্তু যদি আপামর পাঠকসমাজের কথা ভেবে লিখে থাকেন তবে অবশ্যই বলতে হয় যে তার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ এটি এই গ্রন্থটি ভক্তের আবেগবিহ্বলতার চিহ্ন যতই বহন করুকনা কেন তার সাহিত্য মূল্য খুব সামান্যই। কেননা রসসৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠা ইত্যাদির মানদন্ডেবইটি আদৌ উত্তীর্ন হতে পারেনা।

গৌড় ভাগবৎ অশ্বিনী কুমার সাহা রচিত প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ৬২৮ ও ৪৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি বৃহদায়তন চরিত সাহিত্য। এতে ১ম খন্ডে ১৭টি ও ২য় খন্ডে ১৮টি মোট ৩৫টি অধ্যায় রয়েছে। লেখক গ্রন্থারম্ভে নিমাইয়ের 'গৃহত্যাগ' পর্ব দিয়ে অর্থাৎ প্রথাগত ভাবে কোন মহৎ ব্যক্তিত্বের জীবনের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণিত হয় সেই পথে না হেটে ' গৃহত্যাগ ' পর্ব অর্থাৎ যেখান থেকে নিমাই পন্ডিত ' শ্রী চৈতন্য 'তে রূপান্তরিত হবার পথে অগ্রসর হয়েছেন সেখান থেকে গ্রন্থারম্ভ করেছেন। ২য় অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন কোন সামাজিকও রাজনৈতিক পটভূমিতে নিমাই আবির্ভূত হয়েছিলেন। শেষ অধ্যায়ে তিনি বর্ণনা করেছেন শ্রী চৈতন্যর তিরোধান পর্ব। সমগ্র গ্রন্থটিবৈঠকি ঢংয়ে সাধারন পাঠকের ও ভক্তমনের উপযোগী করে লেখা হয়েছে। তবে সব অধ্যায় সমানভাবে উল্লেখ্য হয়ত বলা যাবেনা, তবে তেমন না হলেও দুটিঅধ্যায় উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন তৃতীয় অধ্যায় লীলায় ' চাঁদকাজী দলন' পর্বে এসে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাযথ বিশ্লেষনকরেছেন বিশেষ করে ' চৈতন্য ভগবত ' রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ছাড়া

অধিকাংশই চৈতন্য চরিতকারই এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনায় যাননি। কিন্তু ইতিহাসে এই ঘটনাটিরগুরত্ব বোঝাবার জন্য তিনি ডঃ সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি "It was perhaps the first of civil disobedience in the history of India" (পৃ ১২১) উল্লেখ করে একে ভারতের প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন বলার পর তিনি ঐ একই পাতায় গান্ধিজিকেও উদ্ধৃত করেছেন ।

কিন্তু ৩৫শ অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যর মৃত্যু রহস্য বর্ণনায় অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহন করায় ভক্তির প্রাবল্য যতই প্রমাণিত হোক নাকেন যুক্তির মানদন্ডে তা গ্রহন যোগ্য হতে পারে না । যেমন শ্রীচৈতন্যর তিরোভাব প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ' যিনি গোপীনাথ মন্দিরে ছিলেন তিনি হাহাকার করে বললেন ,

' কি করিব , কোথায় যাব বুদ্ধি নাহি সরে,
গোরাচাঁদে হারাইনু , গোপীনাথ ঘরে ।।'

আবার যিনি ছিলেন সাগর বেলায় তিনি দেখলেন প্রভু নীল মহোদাধিতেনীল কলেবরের সঙ্গে লীন হয়ে গেলেন । আর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গুনকীর্তনরত ভক্ত দেখলেন প্রভু জগন্নাথ স্বামীর সঙ্গে অভিন্ন কলেবর হয়ে গেলেন । এই লীলা রহস্য অবতারের ক্ষেত্রে ওসত্য . (পৃ - ৪৬৭)। যুক্তি বিজ্ঞানের আলোয় এটা বলতে বাধা নেই শ্রী চৈতন্যর মৃত্যু রহস্যময়। ফলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উঠেছেবিভিন্ন লোকশ্রুতি । বিন্তু বিংশ শতকের শেষ পর্বে কোন ব্যাক্তি ভক্ত হলেও এই লোকশ্রুতি গুলিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে অবশ্যই দৃষ্টিকটু লাগে ।

তবে লেখকের ভঙ্গিমা বা স্টাইল বিচারে বলতে হয় তার লেখায় গুরু গাম্ভির্য্য নেই।গভীর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনকে সাড়া না জাগালেও লেখকে বৈঠকি ঢংয়ের জন্য সাধারন পাঠকের উপযোগি হয়েছে বলা যায়। যেমন ' না . না . কোনরকম শাঁখ বাজিয়েএ বিয়ে নয় । বাপরে বাপ ! রাজ পন্ডিতের মেয়ের বিয়ে।' (পৃ - ৫. ১ম খন্ড) অথবা ' নিমাই কি হেটে যাবেন কনের বাড়ীতে ? রাম কহ ! তা কি কখন হয় ? (পৃ - ৬ ১ম খন্ড)

যাই হোক সবশেষে বলা যায় চরিত সাহিত্য হিসাবে এটি চিরকালীন সাহিত্য রসোত্তীর্ণ না হলেও পাঠকের অনুভূতির বিচারে পাঠত্তীর্ণ ।

অশ্বিনী কুমার সাহা রচিত অন্যতম চরিত সাহিত্য লোকপাবন লোকনাথ ১৩৪ পৃষ্টা সম্বলিত একটি প্রন্থ যাতে মোট দশটি অধ্যায়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম কির্তীত হয়েছে । লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভাবশিষ্য অশ্বিনী কুমার সাহা তার এই গ্রন্থে ভক্তির প্রাবল্য যতটা ঘটিয়েছেন যুক্তি তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই । বরং ভক্তি এসে যুক্তি কে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে প্রবল ভাবে । তার উল্লেখিত বহু ঘটনাই যুক্তি তর্কের বিচারে গ্রহন যোগ্য বলে মনে হয় না । যেমন আমেরিকার যে মহিলা পিত্তথলে কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি সেখানকার ভারতীয় চিকিৎসক ডঃ নিশিকান্ত বসুর চেম্বারে এসে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দিব্য মূর্তি দর্শন করলেন ও আকস্মিকভাবে একটি ফুলের পাপড়ি লাভ করে রোগমুক্তির নিশানা লাভ করলেন এটা ভাবা যতই সুখকর হোক কার্যকারণ সম্পর্কের সূত্রে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তা ছাড়া এহেন কান্ডযার জীবনে ঘটেছিল তার নাম ঠিকানার উল্লেখ থাকাও সঙ্গত ছিল (পৃ - ৭৮)। তাছাড়া ফাঁসীর আসামী নিবারণকে যেভাবে লোকনাথ ব্রহ্মচারী নিজে মোকদ্দমার রায় লিখে খালাস করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ - ৮২) অথবা ঝড়ে উত্তাল মেঘনার বুকে ডুবন্ত ষ্টীমারে যাত্রী শিষ্য বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধার করা (পৃ ৮৯)তার ভক্তমনের বিশ্বাসে যতই সত্য বলে প্রতিভাত হোক অপামর সাধারণের কাছে কষ্ট কল্পিত বলেই মনে হবে । তিনি এই প্রন্থে বলেছেন ' হিন্দু ধর্ম কত উদার ' (পৃ - ৩৫) কিন্তু তত্বেও প্রয়োগে উভয়তঃ হিন্দু ধর্মের যে অনুদার ও অমানবিক দিকগুলিও রয়েছে তার উল্লেখ করেননি ।

বস্তুত এই গ্রন্থটি ভক্তমনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য নেই বলা চলে ।

চরিত সাহিত্য

অন্য নেতাজী

হীতেন নাগ

হীতেন নাগের 'অন্য নেতাজী' নেতাজী সম্পর্কে সমলোচনামূলক একখানিগ্রন্থ যাতে গ্রন্থপঞ্জি সহ মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৯ টি তবে এগারটি অধ্যায় সম্বলিত এই গ্রন্থটিকে যথাযথ ভাবে শ্রদ্ধার্ঘ বলাই সংগত এর অনেকগুলি অধ্যায় আছে ব্যাক্তি সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন দিক যেমন তার রসবোধ, পাঠাভ্যাস, কাব্যপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি যা রাজনৈতিক বিশ্লেষনে গৌন

হীতেন বাবুর আলোচ্য গ্রন্থটির তিনটি অধ্যায় আলোচনার দাবীরাখে। এগুলি হল। আইডিয়াল পিতা (১ম অধ্যায়), ওটেন প্রহার পর্ব (৫ম অধ্যায়) এবং রামগড় থেকে রাশিয়া এবং রামপন্থা (৯ম অধ্যায়)। 'আইডিয়াল পিতা' অধ্যায়ে দেখা যায় নেতা সুভাস চন্দ্রকে যেভাবে ক্রমশ দেবতা বানান হচ্ছে এতে তারস্বাভাবিক আপত্তি। কারন তা করা হয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তার কথায় 'ভক্তি শ্রদ্ধায় আপত্তির কিছু দেখিনা। কিন্তু যখন দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করা হয় তখন শুরু হয় ইচ্ছা পুরনের খেলা। (পৃ - ২)। তার মতে ভক্তের চোখে সুভায চন্দ্রের দেবতা বনবার কারণ হল তার দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, সামরিক পোষাকে সামরিক কার্যকলাপ ও তার মৃত্যু রহস্য। যার ফলে বহু ভারতীয়র বিশ্বাস অসম্ভবের পথিক সুভাষচন্দ্র আর পাঁচজন মানুষের মত বিবাহ করে সুখী গৃহকোনে আবদ্ধ থাকার পাত্র নন। কিন্তু আরপাঁচজন মানুষের মত সুভাষচন্দ্রের ওযে নারীসঙ্গ ছিল যা অষ্ট্রীয় নারী এমিলি শেঙ্কলের সাথে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে রূপ নিয়েছিলেন এবং ফলতঃ সুভাষচন্দ্র এক কন্যার পিতা হয়েছিলেন। কিন্তু সাংসারিক বন্ধন তাকে বৃহত্তর কর্তব্য থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। বরং একজন সংসার আবদ্ধ ব্যাক্তি সুভাষচন্দ্র যেভাবে গন্ডির আহ্বানে বন্ধন তুচ্ছ করে এগিয়ে গেলেন তখন লেখকের বিচারে তিনি আরো মহৎ হয়ে উঠলেন। তার এই বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের পত্রকে উদ্ধৃত করেছেন। (পৃ - ৫ ৯)

'ওটেন - প্রহারপর্ব' আলোচনায় সুভাষচন্দ্র যে ওটেন প্রহার পর্বে নিজে ছিলেন না তা বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র স্বরচিত An Indian pilgrim এ যেভাবে নিজেকে eyewitness বা প্রতক্ষদর্শী বলেছেন তা উদ্ধৃত করেছেন। বিশেষ করে জীবন সায়াহ্নে এসে ওটেন সাহেব ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নামে যে কবিতাটি লেখেন তাতে যে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পন করেছেন তাতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে অধ্যাপক ওটেনকে লাঞ্ছনের মূলে সুভাষচন্দ্র যদি থেকেই থাকেন তবে তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা জানাতে গেলেন কেন ? যে প্রশ্নটির উত্তর এখানে পাওয়া যায়নি তা হল ইতিহাসের অধ্যাপক ওটেন যদি সত্যিই দম্ভি সাম্রাজ্যবাদী হয়ে থাকেন তবে ছাত্ররা তাদের জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানাতেন কেন ? আসলে হয়ত এমন কোন ভুল বোঝাবুঝি তখন হয়েছিল যার ফলে ছাত্রদের উপর কর্তৃপক্ষের রোষ প্রতিহত করতে সুভাষচন্দ্র সব দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সে রহস্য এখনো ক্ষন্মোচিত হয়নি।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপষহীন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র, ক্রমশ বামপন্থা, আরো স্পষ্ট করে বললে মার্কসবাদের দিকে ক্রমশঃ ঝুকেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কথা 'সমস্ত ক্ষমতা জনগনের হাতে' যে লেনিনের কথা সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা লক্ষনীয়। সুভাষচন্দ্রের নিজের কথায় 'একমাত্র লেনিন সর্বপ্রকার কোয়ালিশনকে নসাৎ করে আওয়াজ তুললেন সমস্ত শক্তি সোভিয়েতকে দিতে হবে। (পৃ - ৮০) সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটিও প্রমান করে লেনিনের মত ও পথকে তিনি কতটা নির্ভুল মনে করতেন। '১৯২২ সালের ইটালী ছিল সর্বদিক থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তার একমাত্র প্রয়োজন ছিল ইটালিয় এক লেনিনের কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল, সে লোক এল না' (পৃ - ৮১) বস্তুত স্বাধীনতার যোদ্ধা

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত যা এখনো বহুল প্রচারিত নয় তার উন্মোচনে এই বইটি সহায়ক । তবে 'ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ' - এর লেখক জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র কিভাবে মার্কসবাদী - লেনিনবাদী প্রত্যয়ে স্থিত হলেন এই ব্যাপারে বিশেষ কারো প্রভাব কাজ করছে কিনা তা তিনি আলোচনা করেন নি ।

সবশেষে যে কথাটি বলা প্রয়োজন যত বড় হিমালয়প্রতীম ব্যাক্তিত্বই হোন প্রতিটি মানুষই কিছু ভুল করেন , যা তাদের অপূর্নতা বলে গন্য হয়। বস্তুত সব মিলিয়েই তারা মহৎ মানুষ । কিন্তু এই বইয়ে সুভাষচন্দ্রের কোন ভ্রান্তির কথা আলোচনা হয়নি । বিশেষতঃ আজাদহিন্দ ফৌজ নির্মান ও পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ কোন রন্ধ্রপথে ব্যার্থতায় পর্যবসিত হল সেই দিকে তিনি আলোকপাত করেননি । তাই এটি শ্রদ্ধার্ঘমূলক হলেও সঠিক অর্থে সমালোচনামূলক গ্রন্থ নয় ।

চরিত সাহিত্য
সবিতা দেবী

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত সবিতা দেবীর চরিত সাহিত্য 'হে মহাজীবন ' গান্ধিজীকে নিয়ে লেখা ৫৩ পৃষ্ঠার পুস্তিকা বলা চলে । উৎসর্গপত্রে ' লেখিকা ' সতের বছরের বাম রাজনীতির কাপালিক পীড়নে, নির্য্যাতনে সব হারিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন । প্রথমেই বলা ভাল শাসক বামপন্থি হলেই তার সবকিছুই ভাল অথবা সবকিছুই খারাপ বা জনবিরোধী এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহনে কারো ব্যক্তিগত অধিকার থাকতেই পারে । কিন্তু জাতির পিতা মহাত্ম গান্ধী যিনি রাজনৈতিক ভিন্নতা সত্বেও বামপন্থীদের কাছেও শ্রদ্ধার পাত্র তাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের উৎসর্গ পত্র রচনায় এক দেশদর্শিতার ভয় থাকে ।

তবে গান্ধিজীর কয়েকটি উক্তির উদ্ধিতি অহিংসার পূজার গান্ধিজী সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করে , "যেমন যারা অন্তর থেকে অহিংস হতে পারবেননা । তারা সুবিদাবাদের বিকল্প হিসাবে যেন এই অহিংসাকে ব্যবহার না করেন । সে ক্ষেত্রে তাদের সহিংস হওয়ায় শ্রেয় (পৃ- ৪) অথবা "নিস্ক্রিয়, নির্বীর্য এবং অসহায় নতি স্বিকারের চেয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা বরং শ্রেয় ।"(পৃ- ৪) অহিংসা সম্পর্কে গান্ধিজীর এই উক্তি চৌরিচৌরা সত্যাগ্রহ চলাকালীন হিংসাত্বক ঘটনা ঘটবার অজুহাতে আন্দোলন প্রত্যাহার করা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা লেখিকা তার ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি । তবে জনসেবক গান্ধিজীর যে রূপটি তিনি তুলে ধরেছেন (পৃ -৭ -১১) তা যথাযথ । গ্রামোদ্যোগ , চরকা কাটা ইত্যাদি জনসাধারণের একটা পথ হলেও শেষ পর্যন্ত কেন তা মরুবালুতে হারিয়ে গেল তার কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেননি। (পৃ - ১৪ - ১৫)

গান্ধিজীর চোখেনারী (পৃ ১৭ - ২৩) তে তিনি গান্ধিজীর উদ্ধিতি দিয়েছেন ' সীতার সতীত্বের ন্যায় ইহা দুর্দ্ধর্ষ হইবে (পৃ -) । কিন্তু সীতার সতীত্বের প্রতীক যতটা তার চাইতেই অধিক প্রতিবাদের প্রতীক এই সত্যটি উপেক্ষিত হয়েছে কিনা তার ব্যাখ্যা দেননি । শেষাংশে লেখিকার স্ববিরোধিতা লক্ষনীয় । এই কারণে উৎসর্গপত্রে যে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি বিষোদ্ধার করেছেন ৩৯নং পৃষ্ঠায় গান্ধিজীকে সেই বামপন্থীদের অন্যতম কমিউনিষ্টদের সাথে তুলনা দিয়ে বলেছেন "এই ত্যাগি মহাপুরুষটির বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কম্যুউনিষ্ট।

বস্তুত সমগ্র বইটিকে লেখিকার মনের অতি মুগ্ধতার প্রতিফলন বলাই সঙ্গত । কেননা এই চরিত গ্রন্থের কোথাও গান্ধিজীর চরিত্রের ত্রুটি পূর্ণ দিকগুলি বা কোন বিরূপ সমালোচনা তুলে ধরা হয়নি । তাই এই গ্রন্থের সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক মূল্য অকিঞ্চিতকর বলা অসঙ্গত নয় ।

চরিত সাহিত্য

' জয়প্রকাশ নারায়ণ - একটি মূল্যায়ন '
শচীমোহন বর্মন

শচীমোহন বর্মনের লেখা ' জয়প্রকাশ নারায়ণ - একটি মূল্যায়ন ' এমন একটি গ্রন্থ যাতে গ্রন্থপঞ্জিসহ মোট অধ্যায় রয়েছে ছয়টি । ' আশা ভরসা ' শীর্ষক ভূমিকা পর্বে লেখক জানিয়েছেন যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের Dissertation করার সময় তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে তিনি পরিমার্জন করে গ্রন্থাগারে প্রকাশ করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় সহমত পোষন কেউ করুন বা না করুন তিনি যে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিরল মাপের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। বইটিতে জয়প্রকাশ নারায়ণের পারিবারিক পরিচিতি , শিক্ষালাভ ও রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি , বিশ্বাস ও তার ক্রমপরিবর্তনের কথা আলোচিত হয়েছে । বিশেষ করে ভূদান ও সর্বোদয় প্রসঙ্গে ও ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার পূর্বে ও পরে জয়প্রকাশের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে । এই ধরনের গ্রন্থে অনেক সময়ই ভক্তি এসে যুক্তিকে অপসারিত করে । যেমন জয়প্রকাশের ১৯৫০ আলোচনা করতে গিয়ে জয়প্রকাশকে অনুসরণ করতে তিনি বলেছেন । সাম্যবাদ গনতান্ত্রিক সমাজবাদ উভয়ই যা সোভিয়েত রাশিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপে ব্যবহার করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে । সাম্যবাদ যেখানে বিজয়ী ছিল সেখানে একনায়কতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে শেষ হয়েছে । গনতান্ত্রিক সমাজবাদের পশ্চিম ইউরোপের ধারনা শুধু মাত্র সংসদীয় এবং আইনসংগত ধারনাতেই পর্যবসিত হয়েছে । (পৃ ১২)। সুতরাং জয়প্রকাশের সিদ্ধান্ত ছিল সহিংস ও সংসদীয় পদ্ধতি উভয়ই ব্যর্থ হয়েছে । (পৃ - ১২)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জয়প্রকাশের মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে সগর্বে বিরাজ করছে । সুতরাং জয়প্রকাশের ঐ সিদ্ধান্ত তখনকার প্রেক্ষাপটে আদৌ যুক্তিসম্মত ছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর লেখক দেননি ।

জয়প্রকাশ ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন । কিন্তু তার সমাধান কল্পে যে পথনির্দেশ করেছেন তা বাস্তবে সম্ভবপর কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক । তিনি বলেছেন পঞ্চায়েতী রাজের সমস্ত কাজ অরাজনৈতিক স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হবে । যাদের শীর্ষে থাকবে বেসরকারী কৃত্যক (পৃ - ২৫) এবং ' বিধানসভা এবং লোকসভার সদস্যগন একটি নির্বাচক মন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবে । এই গ্রাম সভার সদস্যরা নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যদেরকে নির্বাচিত করবে ' (পৃ - ২৯) অর্থাৎ জয়প্রকাশ নারায়ণ পরোক্ষভাবে সর্বোচ্চ আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনেও অরাজনৈতিক প্রভাব কাম্য বলে মনে করেছেন কিন্তু রাজনৈতিকমত ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা আছে এমন একটি গনতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের অরাজনৈতিক সৃষ্টি সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জীবনীকার দেননি ।

যাইহোক সামগ্রিকভাবে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরবর্তীযুগেও যার ত্যাগ তুলনাহীন তার উপর এই বইটি অনেকটাই আলোকপাতে সমর্থ হবে তাতে সন্দেহ নেই ।

অন্যান্য

দিগ্বিজয় দে সরকার

ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার রচিত দুটি স্বল্পায়তন পুস্তকের একটি হল রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে রচিত প্রশ্নমালা "রবীন্দ্র কুইজ ও উপকথা"। ১৯৮৬ খীঃ প্রকাশিত উপকথা বইটির ২য় সংস্করনে লেখক জানিয়েছেন যে গল্পগুলি তিনি তার মার কাছে শুনেছেন। গল্পগুলির জন্মভূমি হল সাবেক পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশ। প্রধানতঃ শিশু ও কিশোর মনের পাখা মেলবার মাধ্যম হিসাবে তিনি এগুলি লিখেছেন। এই গল্পের মূল গল্পাংশটি হল সাতান্ন পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং এতে মূল গল্পের সংখ্যা হল সাতটি। এগুলি হল রাখাল ছেলে ও বনদেবী, কাক ও চড়াই, রাখাল ছেলে ও কাঁথাবুড়ি, লোভী কাঁকড়া, জোলার ছেলে ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ব্রাহ্মনপুত্র ও দৈত্যকন্যা, কুড়ির ক্ষেত ইত্যাদি। এটি শিশুমনের কাছে পল্লবগ্রাহী সংকলন বলা যায়।

তার রবীন্দ্র কুইজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রশ্নাকারে এমন একটি গ্রন্থ যা শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মনে রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে টুকরো টুকরোভাবে সামগ্রিক চিত্র বাড়িয়ে তোলে।

শিশু সাহিত্য

দিগ্বিজয় দে সরকার

শিশুদের জন্য দিগ্বিজয় দে সরকার রচনা করেছেন দুটি শিশু কথাসাহিত্য সংকলন। একটি হল "মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী" এবং অপরটি হল "কঙ্কাবতীর কথা নকশীকাঁথার মাঠ"। কোন সংকলনই লেখকের মৌলিক রচনা নয়। মহুয়া মলুয়া চন্দ্রাবতী প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকাংশে বলেছেন "অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার তিনটি গীতিকা নিয়ে সংকলনটি তিনি সহজ করে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। মহুয়া-র কাহিনীতে নদের ঠাকুর ও মহুয়ার প্রেমের বিয়োগান্তিক পরিণতি যেমন কাহিনীকে দান করে নতুন মাত্রা, তেমনি রূপবতী মহুয়ার জন্য সওদাগর ও সন্ন্যাসীর লালসা, এমনকি তার স্বামীকে হত্যার প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয় সে যুগে ক্ষমতাবানের কাছে নারীর সম্ভ্রমের কোন মুল্যই ছিল না, এমনকি সেই নারী বিবাহিতা হলেও। মলুয়ার কাহিনীতে সমাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজী ও দেওয়ানের ভূমিকাও এই বক্তব্যর সত্যতা প্রমান করে, এমনকি স্বামীর কাছে তার স্ত্রীকে চাইতেও এদের কোন সংকোচ দেখা যায় না। সংকলনের তৃতীয় কাহিনী অন্যতম মনসামঙ্গল রচয়িতা চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের বিরহাত্বক প্রেমকাহিনী নিয়ে। জয়ানন্দ নিজের জীবন দিয়ে স্বধর্ম ও চন্দ্রাবতীকে ছেড়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারীর কাছে যাবার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল, সে প্রায়শ্চিত্তে চন্দ্রাবতীও সুখী হয়নি, শোকে দুঃখে সেও পাগলিনী হয়ে যায়"।

সমগ্র সংকলনে লেখক যেভাবে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে দেশকালের সীমারেখা ছাড়িয়ে আবহমানের বাংলা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যেমন, "কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন
বাইদ্যার কন্যা খুঁজতে ঠাকুর ভরমে তিরভূবন"।

(মহুয়া,পৃ- ৭)

অথবা,

"উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও
আমি ডাকি পালংসই একবার কথা কও"।

(মহুয়া,পৃ- ১০)

কিংবা, "ভূয়েতে বাইয়া তার পরে লম্বা চুল"।

(মহুয়া,পৃ- ১৩)

বিশেষ করে যখন জয়ানন্দের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে চন্দ্রাবতীর পাষাণবৎ অবস্থা প্রসঙ্গে লেখক উদ্ধৃতি দেন

"না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী"।

(চন্দ্রা,পৃ- ২০)

তখন স্মরনাতীত কাল থেকে সমস্ত বিরহিনী নারীর শোকস্তব্ধতাই চন্দ্রাবতীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে।
দ্বিতীয় সংকলন 'কঙ্কাবতীর কথা নকশীকাঁথার মাঠ'এ দুটিও কালজয়ী রচনা যা তিনি শিশুমনের উপযোগী করে লিখেছেন। প্রথম গল্প কঙ্কাবতীর কথায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন তা অনবদ্য। কঙ্কাবতীর ও খেতুর পারস্পরিক আকর্ষন যেমন সবশেষে মধুর সমাপ্তি লাভ করেছে, তেমনি জ্বরের ঘোরে কঙ্কাবতীর জলের নীচে মাছের দেশে যাওয়া থেকে শুরু করে স্বপ্নে বাঘরূপী খেতুর সাথে কঙ্কার বিয়ে পর্যন্ত এক অনাবিল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। এরমধ্যে ব্যাঙসাহেবের রূপী মিঃ গোমিস এর মধ্যে যেমন উদ্ভট রসের অবতারনা করা হয়েছে তেমনি তৎকলীন সমাজের প্রতি তীর্যক ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। যেমন "এমন সময় এলেন ব্যাঙসাহেব। একেবারে ভারতীয় ব্যাঙ। তাহলে কি হয়। মুখে ইংরাজীর খই ফুটে। সুটকোট পরা ব্যাঙ। সে কঙ্কাবতীকে ইংরাজীতে কি জিজ্ঞাসা করলো। কঙ্কা ইংরাজী বোঝেনা। তখন ব্যাঙসাহেব এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো কেউ নেই। তারপর বাংলায় জিজ্ঞাসা করলো কি চাই হে মেয়েটি"। (কঙ্কাবতীর কথা পৃ- ১১)। তাছাড়া কঙ্কাবতীর পিতা তনুরায়ের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে কিনা বৃদ্ধ পাত্রে দুইটি কন্যা সম্প্রদান করে সে অনেক টাকা পণ নিয়েছে। (কঙ্কাবতীর কথা পৃ- ৫)। এর মধ্যে দিয়ে যেমন অর্থগৃধ্নু পিতার চরিত্র স্পষ্ট হয় তেমনি সেকালে বরপণের স্থলে বহুক্ষেত্রেই কন্যাপণ প্রচলিত ছিল তাও দৃশ্যমান হয়ে উঠে।
সংকলনের দ্বিতীয় কাহিনী নকশীকাঁথার মাঠ পূর্ববঙ্গের বা বর্তমানে বাংলাদেশের ফরিদপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলের প্রচলিত কাহিনী কে জসিমুদ্দিন যে অমরত্ব দান করেছেন তারই সহজতর,সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গদ্য ভাষায় লিখিতরূপ। বলাবাহুল্য জসিমুদ্দিনের কাহিনীতে রূপাই সোনার পারস্পরিক আকর্ষন,বিবাহ ও দাঙ্গাজনিত কারনে রূপাই এর নিরুদ্দেশ হবার পর রূপাই এর জন্যে অপেক্ষারত সোনাই আমৃত্যু যে নকশী কাঁথা বুনে যায় তারই বিয়োগান্তক কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। কখনো নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করে, কখনো আবার জসিমুদ্দিনকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক এখানে সুন্দর আবহ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, "সোনাই ও রূপাই কে দেখে মুগ্ধ হল। কালো চেহারার এত বাহার সে দেখেনি (নকশী কাঁথার মাঠ পৃ- ১৮) রূপাই কে দেখে সোনাইয়ের ভাবনা হয়েছে সোনা নহে পিতল নহে নহে সোনার মুখ কালো বরন চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক (নকশী কাঁথার মাঠ পৃ- ১৮)।"
তাছাড়া জসিমুদ্দিনের মূল রচনায় অধুনা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে জমি ও ফসল নিয়ে দাঙ্গায় যে মর্মান্তিক ঘটনা প্রায়ই ঘটত তাও যেন লেখকের কলমে চিত্রিত হয়েছে "ভীষন দাঙ্গা হলো দুদলে অনেকে আহত হলো (নকশী কাঁথার মাঠ পৃ- ১৯)।" সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে এগুলি লেখকের মৌলিক রচনা নয় বলে ভূমিকায় নিজেই স্বীকৃতি দিলেও দুজন বরনীয় লেখকের রচনা ও তিনটি প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকে সহজভাষায় যেভাবে তিনি কিশোর পাঠকদের দরবারে পৌছে দিয়েছেন তা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে।

ছড়া
শুভাশিস দাস

শুভাশিস দাস এ পর্যন্ত মোট দুইটি ছড়ার বই প্রকাশ করেছেন। বইদুটি হল ছড়া বড়া ও মজায় ভরা সবার ছড়া। এর মধ্যে ছড়া বড়া বইটিতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা আঠাশ ও আঠাশ পাতায় মোট ছড়ার সংখ্যা আঠাশটি এবং বইটির অপর বৈশিষ্ট্য হলো এর কোন পৃষ্ঠাতেই পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়নি। ছড়াগুলির কোন কোনটিতে রয়েছে উদ্ভট রসের উপস্থিতি যা শিশু মনে আনে রিলিফ বা মুক্তি। যেমন,
"কৈ ছড়াতে অ্যাসিড হবে

পড়লে দু চারবার
পড়ার আগে খেয়ে নিও আচার করমচার" (ছড়ান্না) ।
অথবা
ভাত নাকি হয়
সেদ্ধতে চাপালে
রুটি নাকি গম হয়
আগুনেতে ফাঁপালে (উল্টো দেশে)
কোন ছড়াতে রয়েছে সমাজ জীবনে দারিদ্র্যর কশাঘাতের নির্মমচিত্র যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ছড়াকারের মনের গভীর সহানুভূতি । যেমন,
"কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি
শূন্য থাকে বছর ধরি
বদ্ধ এখন গাড়ির চাকা
সারতে হবে, কোথায় টাকা" (নয়কো সহজপাঠ)
আবার কোথাও ব্যক্ত হয়েছে মহান আন্তর্জাতিক আশাবাদ কিংবা সাম্প্রতিক মন্দির মসজিদ বিতর্ক । যেমন,
"বিশ্বে কোথাও থাকবে নাকো
সীমান্ত আর পাসপোর্ট
ইচ্ছে হলে হল্যান্ড থেকে
চলে যাবেন শিয়ালকোট" (চিত্রভানুর ভাবনা)
অথবা,
"মন্দির আর মসজিদে রোজ
প্রার্থনা ওই সুরে,
মানুষ জানুক মিলনবাণী
বিভেদ ভাগুক দূরে ।" (নতুন শতকের ছড়া)
ভাগুক শব্দটির প্রয়োগ ছড়াটির মাধুর্য্যকে যে কিঞ্চিৎ ব্যহত করেছে তা বলা অসঙ্গত নয় ।
শুভাশিস দাসের দ্বিতীয় ছড়ার বই মজায় ভরা সবার ছড়া সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । বইটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা হল তেতাল্লিশ এবং তাতে ছড়ার সংখ্যা হল তেতাল্লিশটি । ছড়াগুলির শ্রেনীবিচারে দেখা যায় চারটি ছড়া মহান ব্যাক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক । যেমন শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ নেতাজীকে, বিদ্রোহী নজরুল, রবি কবি, মুজিব, তাছাড়া একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা শহিদদের নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘমূলক ছড়া রূপকথা নয় দেশভাগের নস্টালজিয়া রয়েছে উদ্বাস্তু ছড়ায়, সাম্প্রতিক পণপ্রথা ও নিন্দিত বধুহত্যার প্রসঙ্গ রয়েছে তার ছড়ায় নারী ছড়ায় ছড়াকার যে উত্তরবঙ্গেরই লোক তার প্রমান তার বহু ছড়াই বহন করে । অনেক ছড়াতেই উত্তরবঙ্গের স্থান নাম গুলি ধ্বনিত হয়েছে । যেমন চরুইভাতির খবর এ কালিঝোরা, হলং, ডিমা,জলঢাকা,জয়ন্তী,তিস্তা,তোর্ষা,দার্জিলিং,চটেরহাট (রিডাকশনে ভরা), শিলিগুড়ি,দার্জিলিং (উত্তরের ছড়া), ইত্যাদি । ছড়া মানে ছড়ায় ছড়াকার ছড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন,
"ছড়া মানে আম কাঠালের
মিষ্টি মধুর রস
ছড়াই পারে বৃদ্ধ শিশু
করতে যুবক বশ ।" (ছড়ামানে পৃ- ১৭)
কিন্তু সচেতন উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হওয়ায় ছড়ার ছন্দ বিঘ্নিত হয়েছে শুধু ভাত,চেনাছবি অথবা নবায়ন ছড়ায় ।
যেমন, "সংবিধানে হয়না কেন
ভাতের কথা লেখা ভাই

আনবো বোমা যুদ্ধ জাহাজ
চাইনা শুধু ভাত যে চাই।" (শুধু ভাত পৃ- ২১)

অথবা,

"হাজার রবি এমন করে খেলার বয়স হারায়
দেশে কি নাই সে মানুষ
এদের পাশে দাঁড়ায় " (চেনাছবি পৃ- ২৪)

কিংবা,

"সবাই যেদিন পারবে দুটো খেতে
এমন দিনের আশায় বাঁধি ঘর
স্বাধীনতার সত্যি নিশান সেদিন
সারাদেশে তুলবে খুশির ঝড়।" (নবায়ন পৃ- ৩৮)

বলাবাহুল্য উপরোক্ত ছড়াতিনটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য যত গভীরই হোক না কেন তা শিশুমনের কাছে কতটা মনোগ্রাহী হবে তা নিয়ে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয় ।

তবে শিশুর জীবন থেকে ছড়ার স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে যাবার জন্য যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ঠাকুরমা,দিদিমাদের হারিয়ে যাওয়া। যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারন ,পাঠ্যপুস্তকের মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও ব্যাপক নগরায়ন যে দায়ী তা ধরা পড়েছে তার ভূতছড়া, শৈশব সইসব,সেকাল একাল ছড়ায়। যেমন,

"নেই ঠাকুমা নেই দিদিমা
ভূতের গল্প বলার
তাই শিখেছো ছোট্ট থেকেই
সাহস করে চলার " (ভূতছড়া পৃ- ৬)

কিংবা,

"ক্ষীর নদীর কূল হারিয়ে গেছে
মাছ নেয়না চিলে
শিশুমনের সবুজ পাখি
হারায় আকাশনীলে।" (শৈশব সইসব পৃ- ১৫)

অথবা,

"বই এর চাপে অস্থির আজ
ছোট্ট শিশুর মাথা
পায়না ওরা খেলার সময়
সময়টাতো যাতা " (সেকাল একাল পৃ- ২৩)

তবে সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় যে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি বাদ দিলে বাকী ছড়াগুলিতে রয়েছে শিশুমনের স্বাভাবিক ছন্দ ও মুক্তি, বিশেষ করে এই অঞ্চলের পরিচিত স্থান নামের ব্যবহার শিশুমনে এনে দেবে বিশেষ মাত্রা ।

অরবিন্দ নিয়োগী

অরবিন্দ নিয়োগীর প্রকাশিত একমাত্র ছড়ার বই "গোল্লা ছড়া" যা কেবল মাত্র শিশুদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে আষাঢ় ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে। ছাব্বিশটি ছড়া সমন্বিত এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ছাব্বিশ। এর মধ্যে খেলনার কান্না, কাকতাড়ুয়া,মারাদোনা,যেমন তিনি, এই চারটি ছড়া সাধারনভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

ছড়া বলতে সাধারনত যে ফ্যান্টাসী বা স্বপ্নকল্পনার জগৎ বোঝায় তা নিখুতভাবে হয়ত আলোচ্য ছড়াগুলির সবকটিতে মিলবেনা,তবে খেলনার কান্না (পৃ- ১) ছড়ায় এই ভাব অনেকটাই রক্ষিত হয়েছে বলা যায়। "বাড়ির বড়দের ব্যস্ততার মাঝে তার সাধের খেলনা গুলি পালিয়ে যাবে বলে শিশু ভাবছে। তাই সে বলছে 'বলতে পার কবের থেকে। খেলনাগুলো বাক্সে আছে বন্দী। পালিয়ে যাবে গভীর রাতে। আটকে ওরা ফন্দী।" কাকতাড়ুয়া (পৃ- ৫) ছড়ায় কাকতাড়ুয়ার বিকৃত রূপ দেখে বয়স্ক পিসিমা হতচেতন হন এবং শেষ পর্যন্ত 'ওঝা বদ্যির ডাক পড়লো এলেন সবাই ছুটে। পিসিমনির জ্ঞান ফরলো পুড়িয়ে সর্ষেঘুটে।' তখন এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন তিনি (পৃ- ১১) ছড়ায় দেখা যায় 'যেমন তিনি সারাটা দেশে ধান্দাবাজী করেন। দেশের বোঝা মনের সুখে। লোকের পিঠে ছাড়েন।' এই কথার মধ্যে দিয়ে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতা যারা দেশপ্রেমের নামাবলী চড়িয়ে দেশের সর্বনাশ করেন তাদের উদ্দেশ্য বিদ্রুপের বান ছুড়ে দেন তবে এই ছড়ার ছন্দ উপভোগ্য হলেও বক্তব্যর অন্তর্নিহিত কথা সব শিশুর মনে প্রবেশ করবে কিনা বলা কঠিন। মারাদোনা (পৃ- ৭) ছড়ায় 'হতে হবে মারাদোনা। করে বাধা চূর্ণ' এর মধ্যে ফুটবলের যাদুকর মারাদোনার প্রতি শিশুমনের স্বাভাবিক অনুরাগ যা বর্তমানে বহুব্যপ্ত তাই প্রদর্শিত হয়েছে। এই ধরনের চলতি বিষয়ের ছড়ায় অর্ন্তভূক্তি অরবিন্দ নিয়োগীর বৈশিষ্ট্য। তার ছন্দবোধ নিয়ে বলা যায় যে ছন্দের স্বাভাবিক ধারা অর্থাৎ অন্তমিল ও ভাবের দোলাকে তিনি অনুকরন করেছেন।

মৃণাল দেব

মৃণাল দেবের ছড়ার বই 'ছড়ার অ্যালবাম' প্রকাশিত হয়েছে ১৪০৪ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ। বইটি ৮ পৃষ্ঠার এবং ছড়ার সংখ্যা ৩৯টি। তবে উৎসর্গ পত্রে তিনি যেখানে দেবলীনা,ময়ুখ ও পায়েলকে উৎসর্গ করেছেন সেখানে ঐ শিশুদের নাম নিয়ে মজাদার কথাগুলিই এক একটি ছড়া হয়ে উঠেছে। যেমন 'দেবলীনা স্কুলের নাম। সবাই ডাকে সোমা। আরো অনেক আছে নাম। বলেন রাঙ্গামামা॥' এখানে লক্ষ্যনীয় প্রথমও তৃতীয় ছত্রের শেষ শব্দ নাম ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ ছত্রের শেষ শব্দ সোমা ও মামা যেমন পরস্পর মিলনান্তক তেমনি প্রথম ও তৃতীয় ছত্র নয়টি বর্ণের ২য় ৪র্থ বর্ণ হওয়ায় ছন্দের বর্ণানুক্রমিক সঙ্গতিও রক্ষিত হয়েছে বলা যায়।

মূল ৩৯টি ছড়ার মধ্যে ৬টি ছড়া হল দেশবরেণ্য মনীষিদের নিয়ে। যেমন গুরুদেব,নেতাজী,মহাত্মা ইত্যাদি। তবে এই ছড়াগুলির কোথাও আলোচ্য মনীষিদের কোন বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা হয়নি। যেমন,

"সুভাষচন্দ্র আসল নাম।
নেতাজী বলেই চিনি।
দেশপ্রেমের অগ্নিমূর্তি।
সকল লোকেই মানি॥" (নেতাজী)।

"আবার মহাত্মা গান্ধী ছড়ায় দেখা যায় মহাত্মা জাতির জনক।
মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী।
অস্ত্র যার অহিংসা।
তার সুরেই বলি যুদ্ধ চাইনা শান্তি॥"

এখানে কোন ভাবে ছন্দের মিলন ঘটাতে গিয়ে সেই প্রচেষ্টা সফল তো হনই নি বরং যেন ছন্দপতন হয়েছে বলে মনে হয়। তার কোন কোন ছড়ায় চিরদিনের শিশুমনের স্বপ্নিল দিকটি ধরা পরেছে একথা সত্য।

যেমন, "জোনাকী দিচ্ছে আলো।

ছোট্ট শিশু মায়ের কোলে।
ভয়েই বলে।
তোমায় আমি বাসি ভালো ॥" (শিশু) ।
কিন্তু কোন কোন ছড়ায় আবার বহুদিন ধরে লোক পরম্পরায় প্রচলিত ছড়াগুলির আভাষ খুজে পাওয়া যায়। যেমন,"ছিপটি হাতে ছোট্ট খোকা। মাছ ধরতে চলল পথে ॥ (খোকার মাছ ধরা) এর সাথে প্রচলিত ছড়া খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে এর সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর না হয়ে পারে না। আর একটা কথা অ্যালবাম বলে পরিচিত এই বইটির উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল,সূচীপত্রে বা বইয়ের ভিতরে কোথাও লেখক পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ করেননি। তবে সামগ্রিকভাবেই বইটি শিশুমনস্তত্বের সুন্দর অভিব্যক্তি তা অস্বীকার করা যায় না।

মনিরা চিশ্‌তি

মনিরা চিশ্‌তির ছড়ার বই'ফুল পাখীদের জলসাঘর'৪৮ পাতা বা তিন ফর্মার এমন একটি বই যাতে মোট ছড়ার সংখ্যা হল চৌত্রিশটি,এর মধ্যে তিনটি ছড়া হল হিন্দু উৎসবকে কেন্দ্র করে। যেমন পুজার গন্ধে (পৃ- ২১),ভাই ফোঁটা (পৃ- ৪৪),দীপাবলী (পৃ- ৪৫),দুটি ছড়া হল দুজন বরেণ্য বাঙ্গালী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ (কবি পুজা পৃ- ৪০) ও নজরুলকে (আগুনের ফুলকি পৃ- ৪১) কেন্দ্র করে। একটি ছড়া হল বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের স্মরনে (একুশে ফেব্রুয়ারী পৃ- ৩৭)। এছাড়া বাকী আঠাশটি ছড়াই পৃথক পৃথক বিষয়কে নিয়ে লেখা। যেমন আজব ফোনের বার্তা (পৃ- ১৩), পঞ্চদশশতাব্দীর ছড়া (পৃ- ৩৫), অভিমান (পৃ- ৩৮)। এর মধ্যে আজব ফোনের বার্তা (পৃ- ১৩) ছড়ায় প্রকাশ পেয়েছে পৃথিবীর পরিবেশের ক্রমপরিবর্তন সম্পর্কে তার ভাবনা যেমন,
"শুধু অঘ্রানে আর ধান পাকেনা
বদল কত কিছু
তোমার শোভায় মুগ্ধ হয়ে
ছুটছি তোমার পিছু ॥
অথবা, আগামী শতাব্দী সম্পর্কে ভাবনা
এ শতাব্দী কেমন হবে
বলতে পারো কেউ?॥" (পঞ্চদশ শতাব্দীর ছড়া পৃ- ৩৫)
তবে প্রথম দুটি ছড়া স্বপ্ন স্রোতে (পৃ- ৫) ও আজব ফোনের বার্তা (পৃ- ১৫) নিরঙ্কুশ ছড়া নয়। এই ছড়াগুলি শুরু হয়েছে পদ্য ঢংয়ের কথার মধ্যেমে। শেষ বিচারে বলতে হয় সাধারনভাবে ফ্যান্টাসী বা অলীক স্বপ্নকল্পনাকে লেখিকা ধরবার চেষ্টা করলেও সামগ্রিক ভাবে সুদৃশ্য এই ছড়ার বইটি পাঠকমনের কাছে তার বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যর অভাবে স্থায়ী আবেদন রাখতে অক্ষম একথা না বলে পারা যায় না।

তপন কুমার চৌধুরী

তপন কুমার চৌধুরীর প্রকাশিত একমাত্র শিশুগল্প ও নাটক সংকলন ' মিষ্টি কথার বৃষ্টি'৫৬ পাতা বা সাড়েতিন ফর্মায় প্রকাশিত সংকলন যাতে মোট গল্প সংখ্যা হল ২১ টি ও সবশেষে রয়েছে একটি শিশুনাটিকা।
সংকলনের 'পিকলুর মা' গল্পটি (পৃ-১৯) একটি সংবেদনশীল গল্প। মাতৃহারা একটি শিশু গভীর রাতে শুকতারার মাঝে তার হারিয়ে যাওয়া মাকে দেখতে পায়,এমন গল্প বাংলা সাহিত্যে আরও নজির থাকলেও এক্ষেত্রে গল্পটি স্বাভাবিকভাবেই এক বেদনার আবহ তৈরী করতে পেরেছে। যেমন'তাইতো পিকলু এতো ভালোবাসে ঐ শুকতারাটাকে। যখন পিকলুর মন ভাল থাকেনা তখন ও চুপি চুপি উঠে আসে ছাতে।'(পৃ- ১৯) অথবা পিকলু বললো"জানো ঠাকমা, এইমাত্র আমার মাকে দেখলাম। তোমার কথাই ঠিক,ঐ শুকতারাটাতেই আমার মা আছেন।" (পৃ- ২১) ।

তবে অধিকাংশ গল্পই এমন এক অলীক কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে যেখানে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা মুছে যায়। যেখানে ফড়িং,প্রজাপতি আর পাখী কথা বলে,ছবির প্রজাপতি উড়ে যায়, খরগোশ নদী পার হতে না পারার দুঃখে কাঁদে, শিশুমন বিচরন করে অলীক স্বপ্নময়তার জগতে। তাই মিঠুনের মনে হয় ' আর ঐ পরীটা?

ওকি সত্যিই এসেছিল? কি জানি! তবে
রামধনুর রঙে মিঠুনের মনটা সত্যিই ভরে উঠেছিল।

সংকলনের শেষাংশে রয়েছে একটি নাটিকা সার্কাস যার কুশীলব হল রিঙ্কু,টুকুন ও সার্কাস পালানো বাঘ,সিংহ,হাতি,উট,জলহস্তী যারা সার্কাসের খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেও আবার শেষ পর্যন্ত টুকুন ও রিঙ্কুর ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ে এক নতুন সার্কাস দলের পত্তন করে। নাটিকা বলে উল্লেখ করলেও এতে নেই চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনাক্রমের উঠানামা এবং সংলাপ বৈচিত্র্য। তবে নাটকটির গান,

"খাঁচা ভেঙ্গে বাইরে এলাম
আজ কি খুশী ভাই
সবাই মিলে মিলিয়া গলা
আনন্দে গান গাই ।" (পৃ- ৫৪)

একটি খুশীর পরিমন্ডল গড়ে তোলে সন্দেহ নেই। সামগ্রিকভাবে বলা যায় লেখকের আন্তরিকতা যতই থাকুকনা কেন বইটি শিশুমনের ফ্যান্টাসী হালকাভাবে ছুঁতে পারলেও শিশুমনের গহীন গভীর জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরতে পারেনি।

নীতিশ বসু

নীতিশ বসু এ পর্যন্ত শিশুদের জন্যে তিনটি গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এগুলি হল 'মোহরের মন','গঙ্গারামের গাধা','সাপের দেশে আবীর'।

সংকলনের গল্পগুলির মধ্যে মোহরের মন গল্পে শিশুশ্রমিকের দুঃখ,তিতিলের দুঃখ গল্পে ডাইনী প্রথার অন্তর্নিহিত রহস্য 'গঙ্গারামের গাধা' সংকলনে 'বানরের সমীক্ষা' গল্পে বনের পশুপাখী প্রধান চরিত্র হলে জলদাপাড়া নামকরনে উত্তরবাংলার স্থানিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। গঙ্গারামের গাধা গল্পেও উত্তরবঙ্গ ও সন্নিহিত আসামের ধুবরী অঞ্চলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ সংকলন সাপের দেশে আবীর গল্পে সাপ সম্পর্কে অনেক প্রচলিত ধারনার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। যেমন জানিয়েছেন কালনাগিনীর বিষ নেই। সাপেরা গান বাজনা শুনতে পায়না ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় সংকলন গুলির গল্পগুলি কয়েকটি সুখপাঠ্য হলেও বাকীগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

কোচবিহারের বিভিন্ন সংকলন পরিচিতি

গোসানীমঙ্গল

গোসানীমঙ্গল কাব্য একান্তবাবেই কোচবিহারের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ একটি মঙ্গলকাব্য। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা থেকে ১১ কিঃমিঃ পশ্চিমে গোসানীমারী নামের একটি স্থানে কোচবিহারের প্রাচীন রাজবংশের রাজা কান্তেশ্বরের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে যার সামান্য ভগ্নাংশ প্রত্নতাত্বিক খনন কার্য্যের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই রাজ্য,রাজপ্রসাদ,ইত্যাদির বিবরন এবং এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চন্ডী। যিনি কামতেশ্বরী দেবী গোঁসানী কর্তৃক পূজিতা বলে গোঁসানী দেবী বলে পরিচিত,সেই দেবীর কাহিনী নিয়ে এই গোঁসানীমঙ্গল কাব্য রচিত। মন্ত্রীপুত্র মনোহরের সাথে রাজা কান্তেশ্বরের রাণী বনমালার অবৈধ প্রনয়ের সন্দেহে রাজা কান্তেশ্বর মনোহরকে হত্যা করে রাণীকে দিয়ে তার মাংস রান্না করে মনোহরের পিতা মন্ত্রী শশীপাত্রকে ভোজন করান,যার পরিণতিতে মন্ত্রী ও হোসেন শাহের ষড়যন্ত্রে কামতাপুর রাজ্য ধ্বংস হয়। এখানে গ্রীক নাটক

ইস্কাইলাসের আগামেনন নাটক ও ইউরোপীয় উপকথার ত্রুবাদুর কবির কাহিনীর সাথে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কামতাপুর রাজ্য ধ্বংসের ঘটনার আনুমানিক তিনশ বছর পর কোচবিহারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা হরেন্দ্রনারায়নের উৎসাহে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট অঞ্চলের অন্তর্গত বানদ্বার গ্রামের বাসিন্দা রাধাকৃষ্ণ দাস (বৈরাগী বা অধিকারী বলেও পরিচিত) ১২৩১ বঙ্গাব্দে (১৮২৩ ২৪ খ্রীঃ) কথিত এই মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। এই পর্যন্ত পুঁথিটির কয়েকটি হস্তলিখিত অনুলিপি পাওয়া গেছে। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৮৯৯ খ্রীঃ) গোসানীমারী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রী ব্রজচন্দ্র মজুমদার কলকাতা থেকে এটিকে মুদ্রিত করে প্রকাশ করেন যার সূত্র ছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দ (১৮২৪ খ্রীঃ) লিখিত একটি হস্তলিপি সেখানে রচয়িতা হিসাবে রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। (সূত্র কোচবিহারের ইতিহাস খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃ ৩৮পাদটিকা)। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে আবার এটিকে হস্তকাকারে মুদ্রিত করেন যথাক্রমে হরিশচন্দ্র পাল ও নৃপেন্দ্র নাথ পাল। বলাবাহুল্য দুটি পুস্তক একই ব্যাক্তি লিখিত কাহিনীর মুদ্রিত রূপ হলেও পাঠভেদ রয়েছে অনেক। দুটি পুস্তকের তুলনামূলক আলোচনা করলেও এই প্রভেদের স্বরূপ ও কারন অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

হরিশচন্দ্র পাল তার গোসানীমঙ্গল কাব্যে প্রকাশ করেছেন ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে এবং এতে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১০। সমগ্র গ্রন্থটি পাঠান্তে দেখা যায় বইটির শ্লোক সংখ্যা ৬৮১ এবং প্রত্যেক শ্লোকে চার চরন করে মোট চরন সংখ্যা ২৭২৪টি। এছাড়া সমগ্র গ্রন্থটির অধ্যায়গুলি এরূপ ১মলহরী পয়ার,১ম লহরী,অঙ্গনার স্বপ্নদর্শন,২য় লহরী,চন্ডীবন্দনা,কান্তেশ্বরের জন্ম,ভক্তিশ্বরের স্বর্গেগমন,দ্বিতীয় লহরী,অঙ্গনার বিলাপ,পয়ার,কান্তনাথের দাসত্ব, কান্তনাথের দাসত্ব মোচন,তৃতীয় লহরী,দশভুজা চন্ডীর প্রতি কান্তেশ্বরের স্তুতি,চতুর্থ লহরী রাজপুরী নির্মান,পঞ্চম লহরী,ষষ্ঠ লহরী,অভিষেক,সপ্তম লহরী,অঙ্গনার মৃত্যু,মোহর নির্মান, কান্তেশ্বর রাজার বিবাহ,অষ্টম লহরী,নবম লহরী,জমাবন্দী,দশম লহরী,পেটলায় সোয়ারী খেলা,দূর্গানটীর বিবরন ,একাদশ লহরী,দ্বাদশ লহরী,জালিজালিনীর কলহ,দ্বাদশ লহরী,ত্রয়োদশ লহরী,গোসানী স্থাপন,চন্ডালিনীর উপর পূজার ভারার্পণ এবং দেউরী কার্যপ্রদান,চতুর্দশ লহরী,পঞ্চদশ লহরী,মনোহর পরিচয়,ষোড়শ লহরী,বনমালা মনোহর কথা,কলাবতী মহিষী ,সপ্তদশ লহরী,অষ্টাদশ লহরী,জান্তিফুল প্রেমকথা,উনবিংশ লহরী,বিংশ লহরী,একবিংশ লহরী,দ্বাবিংশ লহরী,শশীধরের,একবিংশ লহরী,নবাবের আঠারো কোঠা আগমন,চতুর্বিংশ লহরী,কান্তেশ্বরের মৃত্যু,ইত্যাদি। সমগ্র কাব্যটিতে যেমন সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা চিত্রিত হয়েছে তেমনি সংলগ্ন কিছু স্থান নামের উৎপত্তির কারনও বিবৃত হয়েছে। যেমন,চূড়াভান্ডার,হাতিঘুসাখাল,বাড়ীগড়,সাউদালিদিঘা,যোগীঘোপা,মগলকাটা, সওয়ারীগঞ্জ,মালপাড়া,সিদলখুঁচি,পিঞ্জরির ঝাড়,ইত্যাদি।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত নৃপেন্দ্র নাথ পালের ১৪৪ পাতা সম্বলিত গোসানীমঙ্গল সংকলনে মূলকাহিনী বর্ণিত হয়েছে ৫৫নং পৃষ্ঠা থেকে ১৩৫নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত। নৃপেন পাল সংকলিত গোসানীমঙ্গল গ্রন্থের অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ,যেমন মঙ্গলাচরন ,পয়ার,অঙ্গনার স্বপ্নদর্শন, ভক্তিশ্বর ও অঙ্গনার চন্ডীপূজা, কান্তেশ্বরের জন্ম,বিদ্যাশিক্ষা ও অলঙ্কার লাভ,ভক্তিশ্বরের স্বর্গেগমন,,অঙ্গনার বিলাপ, কান্তনাথের দাসত্ব, দাসত্ব মোচন, কান্তনাথের স্বপ্নদর্শন, চন্ডীর প্রতি কান্তেশ্বরের স্তুতি, রাজপুরী নির্মান, কান্তেশ্বরের রাজ্যপ্রাপ্তি,ত্রিপদী,মোহর,কান্তেশ্বরের বিবাহ,জলকেলি ও দূর্গাপুর নগর স্থাপন,রাজার শিকার গমন,মৎস হারাইয়া জালীর রোদন,ত্রিপদী, গোসানী স্থাপন ও চন্ডালিনীর উপর পূজার ভারার্পণ এবং দেউরী কার্যপ্রদান, কান্তেশ্বরের মৃগয়ায় গমন ও নানা স্থানে দেবদেবী প্রতিষ্ঠা,রাজার গৃহে আগমন,গোসানী হাট স্থাপন, ত্রিপদী ইত্যাদি।

এছাড়াও উভয় গ্রন্থের প্রথম তিনটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত কিছু শব্দের ব্যবহারগত পার্থক্য উদাহরন হিসাবে তুলে ধরা হল। নিচে বামদিকে নৃপেন্দ্র নাথ পাল ও ডানদিকে হরিশচন্দ্র পাল সংকলিত গ্রন্থের শব্দগুলির পার্থক্য তুলে ধরা হল। যেমন,

নৃপেন্দ্র নাথ পালের গোসানীমঙ্গল	হরিশচন্দ্র পালের গোসানীমঙ্গল
নিরঞ্জন	নিরাঞ্জন

পিতামাতার	পিতামাতা
আদেশিলা	আদেশে
কান্তেশ্বরে	কান্তেশ্বর
ভজ চন্ডী কর পূজা	চন্ডী ভজ চন্ডী পূজা
ক্ষত্রকূলে	ত্রিকূলে
পাইয়া চন্ডীর বর	চন্ডীর পাইয়া বর
শুনিয়া আকাশ বাণী	শুনিঞা আকাশ বাণী
বেহারে দক্ষিণগ্রাম	বেহার দক্ষিণগ্রাম
শ্রীফল বেলাদি	বেল শ্রীফল
পার্বতীর বাক্যেবর	গ্রাম মধ্যে দিলাবর
দিলা মহেশ্বর	উমা মহেশ্বর

প্রকাশিত দুটি পুঁথির পাঠভেদের কারন হল নৃপেন্দ্র নাথ পাল কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত (বর্তমানে দুস্প্রাপ্য) মুদ্রিত পুস্তকটি পুনঃমুদ্রন করেছেন। অন্য পুঁথির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেননি (সূত্র পৃ- ৪৫ পূর্বভাষ গোসানীমঙ্গল নৃপেন্দ্র নাথ পাল)। এখানে বলা প্রয়োজন সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত পুঁথি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অবিকৃত। তাছাড়া এটি একটি পরিমার্জিত সংস্করন। উপকাহিনীগুলি ঐ গ্রন্থে নেই বলেই সেই সময়ের সামাজিকতা, আচার ব্যবহার ও মানসিকতার ধ্যানধ্যারনা আমাদের কাছে ধরা দেয় না।

পক্ষান্তরে হরিশচন্দ্র পাল বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুর থেকে আবিস্কৃত গোসানীমঙ্গল নামক পুঁথিখানির উদ্ধারকৃত পান্ডুলিপি স্থানীয় ত্রিবৃত্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন ও পরে গ্রন্থাগারে প্রকাশ করেন। ঐ পুঁথি পরিমার্জিত সংস্করন না হওয়ায় সেই সময়ের সমাজচিত্র সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

যেমন গৃহ নির্মান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "শাল খুটা সিঁড়ি করি লোহা খিল দিল।

বেতের ছাউনি দিয়া বাঙলা বান্দিল ॥" (পৃ- ২৪)

অথবা সামাজিক শ্রেনীবিন্যাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে.

"তেলি মালি হাড়ী বাদিয়া মুচিয়ার।

দোকান বাজারি আদি হরকরা আর ॥" (পৃ- ২৪)

তাছাড়া হরিশচন্দ্র পালের সংকলনে ব্যবহৃত শব্দগুলি মধ্যযুগের সাহিত্য বিচারে খুব স্বাভাবিক যা নৃপেন্দ্র নাথ পালের সংকলনে ফুটে উঠেনি। যেমন য়েক, অনুপাস, আকাশি বাণী, শুনিঞা ইত্যাদি।

সর্বশেষে বলা যায় দুটি সংকলনই একই লেখকের নামে প্রকাশিত হলেও হরিশচন্দ্র পালের সংকলন পান্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত বলে তার গ্রহন যোগ্যতা পাঠকের কাছে অনেক বেশি।

কলিদের ভোর

সুনীল সাহা

সুনীল সাহা কর্তৃক ১৩৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বিভিন্ন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত কবিতা সংকলনে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হল ৪৮ অর্থাৎ তিন ফর্মা। এতে মোট ২৮জন কবির ৪২ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কলিদের ভোর নামকরনেই প্রমান এটি অধিকাংশক্ষেত্রে নবাগত কবিদের কাব্য প্রচেষ্টার ফসল। ভূমিকায় তার বক্তব্য স্পষ্ট এই সংকলনের মাধ্যমে যদি কুঁড়িরা প্রত্যুষের আলোতে উদ্ভাষিত হয় তবে তা আমার গর্বের বস্তুই হবে। তবে নবীন কবিদের কাব্য প্রচেষ্টা হলেও কয়েকজন কবির কবিতা আলোচনার দাবী রাখে।

যেমন, অন্ধকার করে দূর
এসো আলো,দাও সুর,
ধন্য করো নিয়ে মোর
কিছু ভালোবাসা
অরন্যের ভাষা ॥ (ভাষা-শুভাশিস চৌধুরী,পৃ ২৬)

অথবা, বৈষম্যর হিমালয় স্পর্শে
উর্বরা পৃথিবী প্রসব করে ক্ষুধা ॥ (মৃত্যুঞ্জয় সে মানুষ উঠে দাড়াচ্ছে-সন্তোষ সেন ,পৃ ৩৪)

তাছাড়া অলক দে সরকারের কবিতা
অন্ধকারে হাতরিয়ে,
সব ভেঙ্গেছি, চুরেছি।
সম্মুখ স্বস্পহীন দগ্ধ পথরেখা ॥" (জীবন মাটিতে-অলক দে সরকার,পৃ- ৪২)
অথবা,

কুমকুম রায়ের কবিতা "লোভ নয় মোহ নয়
ভালবেসে মানুষ মানুষের বাসভূমি
নগর প্রান্তর
আজীবন বহতা নদী সাগর সঙ্গম ॥" (বহতা কুমকুম রায়,পৃ- ৪৩)

তে পাওয়া যায় ঋদ্ধ মননের ছাপ।

সুনীল সাহার অন্য সংকলন গান কীর্তন ৩১ পাতায় মোট ২৯ টি ভক্তিমূলক গান বা কীর্তনের সংগ্রহ গ্রথিত যেগুলির কোন রচয়িতার নাম কোথাও দেওয়া হয়নি ফলে এগুলি লোকসমাজে বিভিন্নভাবে প্রচলিত কিছু গানকে সংগ্রহ করেছেন ভেবে নেওয়া অসঙ্গত নয়। এগুলি সবই বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের বন্দনাগীতি যার আবেদন ভক্তমনের কাছে গভীর হলেও সাহিত্যিক মূল্যায়নে এগুলি নিস্প্রভ বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই এগুলি পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখেনা।

বিপুল আচার্য

বিপুল আচার্যর সম্পাদিত দুই বাংলার কবিতা ১১২ জন কবির কবিতা সম্বলিত ১২০ পাতার একটি সংকলন। এতে যেমন রয়েছে এপার বাংলার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত,প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত,জয় গোস্বামী, ওপার বাংলার শামসুর রহমান,তসলিমা নাসরিন এর মতো স্বনামধন্য কবিরা তেমনি রয়েছেন দুই বাংলার বহু অনামী কবির কবিতাও।

সংকলনের মাত্র দুজন কবির বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতিসত্তা ও স্থান নামের পরিচয় রয়েছে যার থেকে তাদের পরিচয় লাভ করতে অসুবিধা হয়না। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করা বাংলাদেশের অধিবাসীদের স্বাধীনতার জন্য আর্তি রূপ পেয়েছে নাসরিন আলীর কবিতায়।

তিনি বলেন, "তুমি স্বাধীনতার উপর লিখতে বল কবিতা

তোমার ভেতরেই স্বাধীনতা যে আমার বন্দিনী ॥" (স্বাধীনতার গভীরা পৃ- ৫৯)

তাছাড়া শামসুল আলম সাইদের কবিতায় ঢাকা চট্টগ্রামের স্রোতের উদাম আঁচল জড়ানো উল্লেখ (যে আমার প্রতিদিন পৃ- ৫৯) বাংলাদেশের স্থানিকতার পরিচয় বহন করে। মতিয়ার রহমান বিভক্ত বাংলার কোন অংশের বাসিন্দা তা বোঝা না গেলেও তার প্রত্যয়,

"আমার ধ্রুব বিশ্বাস
যারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন ,
তারা আবার ফিরে পাবেন
সোহরাওয়ার্দী শরৎ বোস সুভাষ বোসের
সেই শাশ্বত বাংলাকে
সমাগত এই শতকেই ॥" (কবির স্বপ্ন পৃ- ৭৩)

বাংলাকে এক নতুন স্বপ্ন দেখায় উদ্বুদ্ধ করবে। যদিও তার বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

সংকলনের সম্পাদনা সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা বলা উচিৎ তা হল সংকলক এটিকে উল্লেখ করেছেন দুই বাংলার কবিতা অর্থাৎ বাংলার রাজনৈতিক বিভাজন রেখাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, তবে তাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। কিন্তু সংকলনে তিনি কবিরা কে,কোথাকার,তা লিপিবদ্ধ করেননি। পূর্বোক্ত বিচ্ছিন্ন ব্যাতিক্রম বাদে কবিদের নাম দেখে কে কোথাকার তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়না। কেননা বিভক্ত বাংলার উভয়াংশেই হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মাবলম্বী কবিরা রয়েছেন। এক্ষেত্রে অন্ততঃ যে কোন একাংশের কবিদের স্থানগত পরিচয় দান করলে সংকলনের নামকরন শুধু সার্থক হত এমন নয়, সমান্তরাল বাঙ্গালী জীবনের কাব্য ভাবনার যথাযথ মুল্যায়নও পাঠকের পক্ষে সহজ হত। তবে এই ত্রুটি সত্বেও দুই বাংলাকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য সংকলকের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়।

বিপুল আচার্য সম্পাদিত কবিতা সংকলন "শময়িতা" ১৫০ জন কবির কবিতায় সমৃদ্ধ ৬৪ পাতা বা চার ফর্মার একটি সংকলন। এতে যেমন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল,দক্ষিণাঞ্চলের মেল বন্ধন ঘটেছে,তেমনি মেল বন্ধন ঘটেছে নামী ও অনামী কবিদের কাব্যসম্ভারের। এখানে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়,অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তদের কবিতা তেমনি আছে কঙ্কন নন্দী,রনজিৎ দেব অথবা অনামী বিপ্লব অধিকারী,প্রসেনজিৎ পন্ডিতের কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা,

"তুমি বসে আজ নির্জন উপকূলে
আমি যেন কোন সমুদ্রচারী হাওয়া," (হতাম যদি হাওয়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়,পৃ- ১৬)

যেমন পাঠককে আজও উদ্বেল করে তোলে, তেমনি রনজিৎ দেবের কবিতা,

"ঘরে ভেতর বরফকুচি
জালনা খোলে যেই
স্মৃতির ভারে দুঃখ বোঝা
আগের মতো সেই ॥" (জানালা রনজিৎ দেব,পৃ- ২৮)

অথবা, বিপ্লব অধিকারীর কবিতা, পাল্কি এল পাল্কি গেল হুম হুম নানা ধুন
বেহায়া এই সমাজটাতে ধরল মরন ঘুনে ॥" (সাময়িকী বিপ্লব অধিকারী,পৃ ৫৬)

যেমন এক দিকে সৃষ্টি করে ভাল লাগার আবেশ,তেমনি ঘুন ধরা সমাজের অনিবার্য পরিণতির প্রতি যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবে সংকলনের সব কবিতাই চার ছত্রের হওয়ায় সম্পূর্ন ব্যাপারটা ফর্মাইসি বলে সন্দেহ করার অবকাশ স্বাভাবিকভাবেই থেকে যায়। এছাড়া এতে কবিদের বক্তব্য অতিমাত্রায় সংহত হওয়ায় যেন পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এমন ধারনাও স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়। তবে প্রারম্ভে শময়িতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেছেন যে তিনি পাঠককে এমন শান্তি দিতে চান যা সংহত ও সহজ। সেই মানদন্ডে সম্পাদকের ত্রুটি অবশ্যই

বিশ্বনাথ দাস

১৯৮৩ সালে বিশ্বনাথ দাসের সম্পাদিত কবিতা সংকলন "উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিতা" ২৭ জন কবির ১৩২ টি কবিতা সম্বলিত ১২০ পাতার একটি সংকলন। সংকলনের একটি বৈশিষ্ট্য হল শেষের আট পাতা জুড়ে কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য সংকলনে কোন কোন কবির কবিতায় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, স্থান নাম, বিশেষ ঘটনা, জনজাতির পরিচিতি ধরা পড়েছে। যেমন অপরাজিতা গোপ্পীর সামনে উত্তাল তোর্ষা (পৃ- ১০), ১৯৭৪ এর কোচবিহারের দুর্ভিক্ষকে মনে রেখে মৃত্যু মিছিল (পৃ- ১৪), তুষার বন্দোপধ্যায়ের সামচীর ভূটানী মেয়ে, গয়ের কাটার হাট (সামচীর ভূটানী মেয়ে, পৃ- ২৫), রনজিৎ দেবের গুম্ফা, ভূটানী মেয়ের শরীর (গুম্ফায় এসেছে শীত পৃ- ৫৩), চিলাপাতা ফরেষ্ট (চিলাপাতা ফরেষ্টে ভোর পৃ- ৫৮), বিশ্বনাথ দাসের চিলাপাতা ফরেষ্ট (পৃ- ৮৯), বেনু সরকারের টেরাই (পৃ- ৭৮), অরুনেশ ঘোষের, হে অগস্ত্য উত্তরের শহরে শহরে একা ।। (নিষিদ্ধ যাত্রার শেষে পৃ- ২৮) ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

লক্ষনীয় যে ২৭ জন আলোচ্য কবির মধ্যে মোট আটজন কবির মধ্যে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রতিফলন না ঘটায় কেবলমাত্র ভৌগোলিক বিভাজনরেখা টানা ছাড়া যথাযথ ভাবে উত্তরবঙ্গের সংকলন বলা যথার্থ নয়। তাছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভৌগলিক বিভাজন তার উদার বিস্তৃতির পক্ষে কতটা সঙ্গত তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের অভিধাটিও সংকলক খন্ডিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। কারন সীমানার ওপারের দক্ষিণে পদ্মা নদী ও পূর্বে যমুনা নদী ঘেরা যে বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে তাও উত্তরবাংলা নামে পরিচিত। এই অসম্পূর্ণতা কে সংকলনের খোলামেলা স্বীকৃতি দান করা উচিত ছিল। তাছাড়া আর একটি আপত্তির বিষয় হল নামকরনে শ্রেষ্ঠ কবিতা কথাটির ব্যবহার করা। কেননা সংকলক নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গের সব কবির কবিতাকে স্থান দিতে পারেননি, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতে পারেন এমন কেউ আছেন কিনা তা এই সংকলনের পাঠক অনুধাবন করতে পারবেননা। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সংকলক তার বিচারের মাপকাঠিই পাঠকের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তবে সামগ্রিকভাবে এটি এমন একটি সুখপাঠ্য সংকলন যা আশির দশকের সামগ্রিকভাবে না হলেও উত্তরবঙ্গের কাব্য জগতের অনেকটা পরিচিতি তুলে ধরে।

স্বাক্ষর

১৯৯৫ সালে দিগ্বিজয় দে সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে কবিতা সংকলন "স্বাক্ষর"। প্রকাশিত এই সংকলনে ২২ জন কবির প্রত্যেকের দুটি করে মোট ৪৪ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলনের বৈশিষ্ট্য হল এখানে কবিতাগুলি ছাপাখানার সাধারন হরফে মুদ্রিত না করে প্রত্যেক কবির কবিতার পান্ডুলিপি ফটোকপি বা আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে। সংকলনের প্রথম কবি "প্রাচেতস"। বুঝতে অসুবিধা হয় না এটি লেখকের ছদ্মনাম। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছদ্মনাম গ্রহন করার মধ্যে কবির কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে তা বোঝা গেল না। তবে সংকলনের প্রায় সব কবিতাই প্রতিবাদী ভাবনার অনুসারী বলা যায়।

যেমন, "প্রসাদ বৈভবে

বৃহন্নলা বুদ্ধিজীবি করে স্তাবকতা ।। " (আরণ্যক এ সমাজ প্রাচেতস, পৃ- ১)

অথবা,

"আমাকে পীড়িত করে মেধাবী যুবকের
বেকার জীবন
আমাকে পীড়িত করে শহীদ মিনারে
রাজনীতিকের ভাষন ।।" (একবিংশ [illegible] শংকর চট্টোপাধ্যায় [illegible]

কিংবা, "জীবনে নিত্য বাঁচার শ্লোগান দিই " (মৃত্যুর কথা শুনেই সুবোধ সেন ,পৃ- ১৫)
দিগ্বিজয় দে সরকারের কবিতায় ধ্বনিত হয় চিরন্তন আশাবাদ,
"তার চেয়ে চলো আশার জোনাকী জ্বেলে
চেয়ে থাকি কখন সে পাখী আসে ॥" (আবাদ,পৃ- ১৭)
তবে বিশ্বনাথ দাসের কবিতা মৃত্যুবোধ এ মৃত্যুর চিরন্তনতা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য আলংকারিক হয়ে উঠতে যেমন পারেনি, তেমনি
"দীর্ঘকাল পৃথিবীতে বাস করার পর
আমাদের মৃত্যু হবে ॥" (মৃত্যুবোধ,পৃ- ২০)
কবিতার ছন্দবোধ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়েছে তাই নয়,ছন্দবদ্ধতাকে বাহত করেছে বলা যায় ।
শুভাশিস দাসের তসলিমা নাসরিনকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতায় এক আর্তি প্রকাশিত হয়েছে । যেমন,
"মানুষকে ভালোবাসো তাই আমি আছি
দূরনা তসলিমা,খুব কাছাকাছি ॥" (কবিতা সম্প্রতি ১৯৯৫,পৃ- ৩২)
চূড়ান্ত আলোচনায় বলা যায় যে কোচবিহারের যে কবিরা সচেতন ভাবনার বলয়ে বলয়িত হন এই সংকলনটি যেন তাদেরই ক্ষুদ্র দর্পন ।

রাজবংশী কবিতা সংকলন
যতীন বর্মা / বিনোদ বিহারী বর্মন

১৯৯৬ সালে যতীন বর্মা বিনোদ বিহারী বর্মনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত ১১৬ পৃষ্ঠার রাজবংশী কবিতা সংকলন এ মোট ৫৫ জন কবির রাজবংশী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনের ভূমিকা লিখেছেন ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায় ও পরিচায়িকা লিখেছেন ডঃ রমেন্দ্রনাথ অধিকারী ।
সংকলনটি যদিও রাজবংশী ভাষায় প্রকাশিত কবিতার,তবু তার মধ্যে ১৫ জন কবিই অরাজবংশী পরিবারসম্ভূত । প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ডাং ধরী মাও যা স্বাধীনতা পূর্ব যুগে সমাজবিরোধীদের হাতে নারী লাঞ্ছনার এক প্রামান্য দলিল,পক্ষান্তরে নিবারন পন্ডিতের 'হাউসের পাসুন' (পৃ ৪৯) এতদঞ্চলের কৃষকদের দুঃখ বেদনাময় জীবনের দলিল বলা চলে। তবে শেষ দুই পৃষ্ঠায় ভিন্ন উপভাষীদের কথা ভেবে একান্তভাবেই রাজবংশী শব্দগুলির প্রচলিত বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। তবে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ বাড়ার জন্য এই সংকলন একটি অভিনব প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই ।

এ সময়ের কবিতা ভাবনা
সমীর চট্টোপাধ্যায়

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ১১৩ পৃষ্ঠার সংকলনে মোট ৩৪ জন কবির কবিতা আলোচিত হয়েছে। শেষাংশের চার পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে কবিদের ব্যাক্তিগত পরিচিতি । ভূমিকায় সংকলক বলেছেন ষাট,সত্তর ও আশি এই তিন দশকের কবিদের আলোচনা সংকলনে সংকলিত হয়েছে,কিন্তু কোন কবি কোন দশকের যুগচিহ্নকে প্রধানত বহন করেন তার উল্লেখ কোথাও নেই। ফলে সংকলকের উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ সময়ের কবিতা ভাবনাকে তুলে ধরা তা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ থেকেছে বলা যায় না । লক্ষনীয় সংকলক ভৌগলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের একাদিক্রমে লিখে চলা নামী ও অনামী সব কবির কবিতার আলোচনাই অর্ন্তভূক্ত করেছেন তবে নামকরনে এ সময়ের কবিতা ভাবনা কথাটি থাকায় বলতে অসুবিধা নেই এক্ষেত্রে যে ত্রুটিটি লক্ষনীয় তা হল যাদের কবিতা আলোচিত হয়েছে এমন কয়েকজন কবির কবিতার সূত্র যথাযথভাবে উল্লিখিত হয়নি। যেমন 'কবিতার সূত্র নেই সুপারহিট মোকদ্দমা' মল্লিকা সেনগুপ্ত আলোক ভাস্বতী রায় চৌধুরী (পৃ- ২), অথবা লেখা নেবেন তুষার রায় আলোচক বিভাস কুমার সরকার (পৃ- ৩৩) লক্ষনীয় বিষয় এখানে তুষার রায়ের

পূর্বের কবিকৃতি সম্পর্কে বলেছেন কবির পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ বা অন্যান্য প্রকাশিত কবিতা সম্পর্কে আমার ধারনা বা জ্ঞান সীমিত (পৃ- ২)। বুঝতে অসুবিধা হয় যে কবি সম্পর্কে আলোচকের জ্ঞান ভাসাভাসা তাকেই কেন এই বিশেষ কবিতা সম্পর্কে আলোচনার দায়িত্ব অর্পন করা হল।
সবশেষে বলতে হয় যে যেহেতু সংকলনটির নাম এ সময়ের কবিতা ভাবনা সেই কারনে ওপার বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের তিন যুগের কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় কবির কবিতা অর্ন্তভূক্ত করলে সংকলনটি সমৃদ্ধতর ফসল হিসাবে গন্য হতে পারত।

সংকলন

নৃপেন্দ্রনাথ পালের সব কটি সংকলন অন্যর রচনার পুণর্মুদ্রন বলা যায়। গোসানীমঙ্গলের পর ধরা যায় সুনীতি দেবীর ভারতের রূপকথার কথা যা সুনীতি দেবীর ইংরাজী সংকলন 'Indian Folk Tales' এর বঙ্গানুবাদ। ৯১ পৃষ্ঠার এই সংকলনে মোট গল্প আছে ছয়টি। এগুলি হল, ছুঁচকুমার,সর্পরাজ কুমার,বানর,সবুর করো,মৃত রাজ কুমার,দুপরাজ। গল্পগুলির মধ্যে রেভারেন্ড লালবিহারী দে এর 'Folk Tales of Bengal' এবং পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রূপ কথাগুলির সাদৃশ্য খুবই লক্ষ্য করা যায়। মহারানী সুনীতি দেবী যদিও এটি স্বাধীনতা পূর্ব যুগে লিখেছিলেন। কিন্তু নৃপেন্দ্র নাথ পাল ১৯৮৬ সালে এর বঙ্গানুবাদ করেন।
১৯৮২ সালে মৃনালকান্তি দাস ও নৃপেন্দ্রনাথ পাল যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছেন কোচবিহারের কবি দ্বিজ মাধবচন্দ্র বিরচিত "চন্ডিকার ব্রতকথা"। পরিচায়ক সংকলকদ্বয় বলেছেন মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়নের (১৮৩৯ ১৮৪৭) রাজ্যারোহনের সময়েই দ্বিজ মাধবচন্দ্র শর্মা চন্ডীকার ব্রতকথা রচনা করেন যা রাজা শিবেন্দ্র নারায়নের প্রশস্তিতে পরিপূর্ণ। শিবেন্দ্র নারায়নের প্রিয় ভক্ত মাধবচন্দ্র তারই নির্দেশে পুরানে উল্লিখিত চন্ডী দেবীর মাহাত্ম্য ও মঙ্গলচন্ডীর মাহাত্ম্য নিয়ে চন্ডীকার ব্রতকথা রচনা করেন। মূল বইটি বর্তমানে ডঃ শশীভূষন দাসগুপ্ত কৃত "A-Descriptive Catalogue of Bengali Manuescripts Preserved in the State Library of Cooch Behar (1948)" এর পুঁথি তালিকায় ২৯ নং পুঁথি হিসাবে রক্ষিত আছে। ৪০ পৃষ্ঠার মুদ্রিত এইটির শেষাংশে সংকলকদ্বয় শব্দসূচি গ্রথিত করেছেন যা বইটির পাঠে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কমলেশ সরকার

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈচিত্র্য হল কামদেবতা মদনের আরাধনা। মদনের প্রতীক হিসাবে এখানে তাই বাঁশ পুজা করা হয়। দুটি দীর্ঘ বাঁশ উঠানে তুলসী মঞ্চের পাশে বা বাড়ির বাইরের দিকে পোতা হয় এবং বাঁশে কাপড় জড়িয়ে চামর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দুধের সাথে চালের গুড়ো,ভাঙ দিয়ে নাড়ু তৈরী করে অন্যান্য উপচার সহ উৎসর্গ করা হয় কামদেবতা মদন কে। এই পুজার শেষ দিনের উৎসবের প্রধান অংশ হল গান যাকে "জাগের গান" বলা হয়। এই গানে অশ্লীলতা যুক্ত হয়,এটি গ্রামের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়, এবং এতে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভূমিকায় সংকলক বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি,কুমারসম্ভব কাব্য উদ্ধৃত করে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি আলোচনা তার সংকলন ও আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক করবার চেষ্টা করেছেন (পৃ- ৩ ভূমিকা)। দশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ পর্বে বিভক্ত ষোল পৃষ্ঠা বা এক ফর্মার এই সংকলনটি পৃথকভাবে আলোচনার দাবী রাখেনা। কারন এটি সংকলকের মৌলিক রচনা নয়, রাজবংশী সমাজে বহু যুগ প্রচলিত লোকাচার ও গীতকে তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে সংকলন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তবে সংকলনটিতে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল এতে প্রকাশনার কোন সময় উল্লিখিত হয়নি। বলা যায় এতে রাজবংশী সমাজের লৌকিক সংস্কৃতির এক সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়েছে।
এই বিষয় নিয়ে বহু সংকলকের ন্যায় কমলেশ সরকারও একটি ক্ষুদ্র সংকলন প্রকাশ করেছেন।

কোচবিহারের কবিতা

মৃনাল দেব

১৯৯৫ সালে মৃনাল দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত সংকলন "কোচবিহারের কবিতা" কোচবিহার জেলার নানা প্রান্তের অগ্রজ অনুজ কবিদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কোচবিহার জেলার সমস্ত কবিদের লেখাই এই সংকলনে স্থান পেয়েছে এই দাবী হয়ত করা যাবে না। সে দাবী সংকলক নিজেই করেননি। কিন্তু অনেকের কবিতাই যে এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। ফলে ক্ষুদ্রাকারে জেলার কাব্যকৃতির একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সংকলন এটি বলা অসঙ্গত নয়। ১৫২ পৃষ্ঠার এই সংকলনে মোট কবির সংখ্যা ৭১ জন। স্বাভাবিক ভাবেই অধিকাংশ কবিরই একাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে, ফলে দেখা যায় ৫০ এর দশক বা তারও আগে থেকে যারা লিখছেন তাদের মধ্যে, কল্যানী মজুমদার, যিনি বর্তমানে প্রয়াত, তাছাড়া মহিলা কবিদের মধ্যে অপরাজিতা গোপ্পীর কবিতা রয়েছে। রয়েছে ষাট দশকের কবি রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, অরুনেশ ঘোষের কবিতা, তেমনি রয়েছে তরুনতম কবি গৌরাঙ্গ সিন্‌হা, প্রসেনজিৎ পন্ডিতের লেখাও। বহু কবিদের কবিতার আসরে সব কবির কবিতা সমান ভাবে মানোত্তীর্ণ হয়ত নয়। তবে কারোর কারোর কবিতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে এতে সন্দেহ নেই। যেমন-

অপরাজিতা গোপ্পীর, "মেঘে ঢাকা আকাশ
জনশূন্য পথঘাট
পৃথিবীতে নামে অন্ধকার,
অন্ধকারের রহস্য ঘিরে
ছিল তোমার আবির্ভাব ॥" (কবিতার মিষ্টি গন্ধ, পৃ- ১১)

কিংবা, সবিতা দেবীর প্রশ্ন, "নারীরা কি কেবলই ফ্যাশান প্যারেড আর
মঞ্চে শোভা কেতকী কামিনী ॥" (তসলিমাকে পৃ- ১২)

আমাদের বর্তমান সভ্যতায় নারীকে পণ্য বানাবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরব ধিক্কার জানায়।

সমালোচনায় বলা যায় কোচবিহারের কাব্যকৃতির পরিচায়ক এই সংকলনে স্থানীয় উপভাষায় লেখা কোন কবিতা সংকলিত হয়নি। সংকলকের তা সচেতন উদ্দেশ্যও ছিল না (সূত্র সম্পাদকীয়, ২য় অনুচ্ছেদ, কোচবিহারের কবিতা)।

যাই হোক সামগ্রিকভাবে সংকলনটি কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থানের, সময়ের ও বয়সের বিভিন্নতা জনিত কাব্যবৈচিত্র্যের সুন্দর দলিল বলা যায়।

তরঙ্গ

১৯৭১ সালে নরেশ রায় সরকার, মৃনাল কান্তি দাস ও দিগ্বিজয় দে সরকার সম্পাদিত তরঙ্গ সংকলনের ভূমিকায় সম্পাদকমন্ডলী বলেছেন, "কোচবিহারের প্রবীন ও নবীন কবিদের কবিতায় হাজারো জীবন জিজ্ঞাসা তরঙ্গায়িত। সেই মহতী অর্ঘ্যে জন্ম নিল তরঙ্গ।" ৭৬ পৃষ্ঠায় মোট ৭০ জন কবির কবিতা। অনেকেরই একাধিক কবিতা। এখানে ৭০ দশকের অগ্রজ ও অনুজ অনেকের কবিতাই রয়েছে যাদের অনেকেরই লেখনী আজো কম বেশী সক্রিয়, যেমন নীরজ বিশ্বাস, সমীর চট্টোপাধ্যায়, সবিতা দেবী, রণজিৎ দেব, নরেশ রায় সরকার, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, অরুনেশ ঘোষ ইত্যাদি। আবার অনেকেরই লেখনী নির্বাপিত প্রায়। যেমন, সুবোধ রায়, রঞ্জন রায়, হরিপদ পাল, গীতিকা লাহিড়ী, সত্যেন লাহিড়ী, মৃনাল দাস, ভূদেব সাহা, স্বপন ভৌমিক, প্রতীপ মজুমদার ইত্যাদি।

আলোচ্য সংকলনে বিভিন্ন কবির কবিতায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

আবু তাহের, "এতদিনে ফের সাড়া দিল বুঝি কোচবিহার" (আওয়াজ, পৃ- ১৬)

যেমন রজত রায়ের কবিতায় ভন্ড দেশপ্রেমের ধ্বজাধারীদের উদ্দেশ্য বিদ্রুপ ফুটে উঠেছে,

"দেশপ্রেম তো মূলধনী কারবার

ডাইরেক্টর বোর্ড নীতি নির্ধারক ॥" (আল এজেন্সী,পৃ- ১৮)

আবার নীরজ বিশ্বাস বলেন, "পৃথিবী গভীর কণ্ঠ নগ্ন বিচারক " (আদালত,পৃ- ২১)

কল্যানী মজুমদার তার কবিতায় সাধু ভাষা রীতি ব্যবহার করেছেন,

সুধা ভান্ড হাতে লয়ে আসিয়াছি নামি
নাহি শোক,নাহি দুঃখ,নাহিরে ক্রন্দন ॥" (ত্রিকাল,পৃ- ৩০)

নরেশ রায় সরকারের কবিতায় মালদা,লোটন মসজিদ,চিকা মসজিদ,ফিরোজ মিনার ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের পরিচিত নাম বিবৃত হয়েছে।

দিগ্বিজয় দে সরকার বাংলাদেশের নির্যাতিত মানবাত্মাকে উদ্দেশ্য করে তথাকথিত বিশ্ববিবেককে বিদ্রুপ করেছেন,বিশ্ববিবেক কোথায় ছিলে ইন্দোনোশিয়ায়

ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া আজো জবাব চায় ॥ (বিশ্ববিবেক,পৃ- ৪৫)

পরেশ মন্ডলের কবিতায় পূর্ব বাংলার স্মৃতির নস্টালজিয়া,

" চাটুজ্জ্যে বাড়ীর চড়ক মেলার পথ কাশফুলের সমুদ্র
পদ্মার বুকে সৈয়দমাঝির ভাটিয়ালী
আজ সব ছবি ॥" (ছবি,পৃ- ৭০)

অরুনেশ ঘোষ বলেন, "রাইমোহন ভুলে গেছো
শীতের বৃষ্টির রাতে আমাদের দীর্ঘ হেটে যাওয়া ॥ " (রাইমোহনকে,পৃ- ৭৪)

যাই হোক সমগ্র সংকলনটি কোচবিহারের এক বিরাট সংখ্যক কবির মানসিকতার প্রতিনিধি স্থানীয় সংকলন বলা অসঙ্গত নয়।

গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতির গান

হেমন্ত কুমার রায় বর্মা

হেমন্ত কুমার রায় বর্মা রচিত এই গ্রন্থটি অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল অর্থাৎ বিশেষভাবে রংপুর ও কোচবিহার জেলায় প্রচলিত গোপীচন্দ্র ও ময়নামতির জীবন কাহিনীর লেখ্য রূপ। রচনাটির প্রচ্ছদে লেখক বলেছেন এটি হল কামতাপুরী তথা বেহারী তথা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক তথা রাজবংশী ভাষায় রচিত মৌলিক মহাকাব্য। প্রথমেই ধরা যাক লেখকের মৌলিক মহাকাব্য দাবীটি সম্পর্কে। প্রথমত এটি মৌলিক রচনা বলতে কার মৌলিক রচনা তা স্পষ্ট করে বলেননি। তার নিজের ভাষায় ১৯০৮ সালে নীলফামারীর মহকুমা শাসক নাথ সম্প্রদায়ের গায়কদের কাছ থেকে গানগুলি সংগ্রহ করার পর ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এগুলিকে প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত এগুলির কোন লিখিত রূপ পাওয়া যায়নি। সমস্ত গানগুলিই ছিল যুগযুগ ধরে লোকমুখে প্রচারিত। ফলে এটি আভিধানিক অর্থে কারো মৌলিক রচনা বলে গন্য হতে পারে না। কেননা রামায়ন,মহাভারত,ইলিয়াড,ওডিসি বা শাহনামার কাহিনীর মত এর কাহিনীর নেই বিশালতা ও ব্যাপ্তি। তাছাড়া সংকলক তথা শব্দটির মধ্যে দিয়ে হয়ত ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যর সব দিকই স্পর্শ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কামতাপুরী শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক কামতাপুর যে অধুনা লুপ্ত রাজ্যের নাম ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেখানকার অধিবাসী সবারই ভাষা কামতাপুরী বলে গন্য হতে পারে এই দিকটির চেতন বা অচেতনায় এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। আবার বেহারী বলতে তিনি যদি কোচবিহারের স্থানীয় ভাষা বৈশিষ্ট্যর দিক ইঙ্গিত করে থাকেন তবে তার জানা উচিত ছিল বাংলা ভাষার এই ভাষা বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র কোচবিহারের একক বৈশিষ্ট্য নয়,সংলগ্ন অন্য জেলারও ভাষা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই ব্যাপ্তিকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে কখনো উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা বৈশিষ্ট্য আবার কখনো বা রাজবংশী ভাষা বৈশিষ্ট্যর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ হল একটি ভৌগোলিক সীমানা যা উভয় বঙ্গের অর্ন্তগত গঙ্গা পদ্মার উত্তরাঞ্চলীয় ভূখন্ড,যেখানে বরেন্দ্র ও কামরূপী দুটি স্বীকৃত উপভাষা রয়েছে। রয়েছে বহু জাতিগোষ্ঠীর নাম,এই তথ্যটুকু সংগ্রাহক যেন বিস্মৃত

হয়েছেন। তাছাড়া রাজবংশী বলতে একটি জাতিগোষ্ঠী বোঝায় যারা বঙ্গের বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানায় বসবাস করলেও একই উপভাষার অন্তর্গত নয়,এই সত্যটুকুও তার ভূমিকায় প্রতিফলিত হয়নি। তাছাড়া তিনি বাংলা ভাষার একটি কথ্য রূপকে বিভিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র ভাষা পরিচিতি প্রদানের চেষ্টা করেছেন যা ভাষা বিজ্ঞান বিরোধী। মনে রাখা দরকার স্বতন্ত্র ভাষা বলে পরিচিত হতে গেলে কোন ভাষার নিজস্ব prefix,Suffix,Syntex অর্থাৎ উপসর্গ,প্রত্যয় ও পদবিন্যাস রীতি তৈরী হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য সেই নিরিখে গোপীচন্দ্রের গান বা মানিক চাঁদের গান বা ময়নামতির গান সার্বিকভাবে বাংলা ভাষারই একটি রূপ বলা সার্বিকভাবেই সঙ্গত।

ক্ষুদিরাম রাউৎ

চাকরি সূত্রে কোচবিহারে আসা ক্ষুদিরাম রাউৎ কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের শহর,প্রকৃতির মাঝে তার মনের বিস্তৃতি ও স্ফূর্তিকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই দেখা যায় কোচবিহার জেলা বিশেষ ভাবে তার লেখনিতে ঠাঁই পেয়েছে।

কোচবিহারের পটভূমিকায় রচিত ক্ষুদিরাম রাউতের গ্রন্থের নাম হল "মহারাজার দেশে"। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল কোচবিহার। সতীকান্তের জবানীতে লেখক এখানে সাবেক দেশীয় রাজ্য বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় সুসজ্জিত জেলা শহর কোচবিহারের জ্যামিতিক সৌন্দর্য্য,বিভিন্ন মন্দির এবং অতিক্রান্ত রাজাদের সম্পর্কে তার মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গের বর্তমান কালের কোচবিহারের সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন ব্যাক্তিদের নামও উল্লিখিত হয়েছে। তবে একথা বলা ভাল যে আবেগ বিহ্বলতা বিচারে গ্রন্থটি মত উল্লেখযোগ্য নয়। বরং যথাযথভাবে বলতে গেলে এটি এমন একটি বিবৃতি প্রধান গ্রন্থ যার অন্যতম প্রধান উপাদান হল আবেগ।

কৃষ্ণেন্দু দে

কৃষ্ণেন্দু দের এ পর্যন্ত প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ হল "তিস্তাচরের মানুষখেকো এবং জঙ্গলের আতঙ্ক"। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমীতিথিতে। প্রথম গল্পে রয়েছে মোট ৯ টি গল্প। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস" জানিয়ে রয়েল বেঙ্গল নামকরনের সম্ভাব্য কারন ব্যাখ্যা করেছেন এবং জীববিজ্ঞানের সংজ্ঞায় প্রানীবর্গে এদের স্থান নির্ধারন করেছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ জঙ্গলের আতঙ্ক ছয়টি শিকার কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম গল্প 'ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক প্যান্থার' লেখকের দ্বিমুখী মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সেখানে দেখা যায় আদিবাসী মেয়ে চাঁদনী যাকে সকলে বাঘিনী কন্যা বলে গন্য করে,কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আদিবাসীদের উন্মত্ত জিঘাংসার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার আকুল প্রয়াস। লেখকের ভাষায় " তীরের ফলায় বিষমাখানো থাকে,সেই বিষ কি কাজ করছে ? করুক চাঁদনী ওসব পরোয়া করেনা। আগে তাকে ডাকবাংলার শিকারী বাবুদের কাছে পৌঁছাতে হবে" (জঙ্গলের আতঙ্ক,পৃ- ৪১)। আবার গল্পের শেষে দেখা যায় ব্ল্যাক প্যান্থারকে হত্যা করার পর বাড়ি ফিরে যাবার পথে চাঁদনীর ঘরে তাকিয়ে দেখেন "মাটির উপর শুয়ে আছে চাঁদনী চিৎ হয়ে,চোখ দুটো খোলা,ঠোঁট ফাঁক করা,শ্বা-দন্ত বেরিয়ে আসছে,মুখের কষ বেয়ে রক্ত নেমে আসছে,সারা মুখে যেন চিতাবাঘিনীর হিংস্রতা ঝড়ে পড়ছে,হাতদুটো সামনের দিকে তোলা আঙ্গুলগুলো বাঘিনীর মতো বাঁকান,সমস্ত শরীরটা শক্ত,প্রান নেই দেহে" (জঙ্গলের আতঙ্ক,পৃ- ৫৮)। বর্ণনায় প্রমাণিত লেখকের অবচেতন মন চাঁদনীর বাঘিনী সত্তা সম্পর্কে জনশ্রুতিকেই আঁকড়ে ধরেছে। সংকলনের বাকী গল্পগুলি পৃথকভাবে উল্লেখের দাবী রাখে না। বলা যায় প্রখ্যাত শিকারী জিম করবেটের শিকার কাহিনীগুলিরই যেন ছায়াপাত ঘটেছে তার কাহিনীগুলিতে। তবে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলি সাধারনভাবে পাঠকের মনোরঞ্জন করে।

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত "বিষয় কোচবিহার" এর প্রচ্ছদে সংকলক প্রথমেই বলেছেন এটি হল শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের পূনর্মুদ্রন। ১৮০ পৃষ্ঠার এই সংকলনে প্রস্তাবনা বাদে চারটি অধ্যায়ে চারটি মূল গ্রন্থের পূনর্মুদ্রন করে সংকলকের মন্তব্য সহ প্রকাশ করা হয়েছে।

পূনর্মুদ্রিত গ্রন্থগুলি হল মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবীর "বেহারোদন্ত", যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "কোচবিহারের ইতিহাস", রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্যদর রচিত "মহারাজ বংশাবলী" এবং উত্তরপূর্বাঞ্চলে গভর্নর জেনারেলের প্রধিনিধি জেনকিন্সের প্রতিবেদন। প্রস্তবনা পর্বে সংকলক ১৮৬৪ খ্রীঃ শ্যামধন মুখোপাধ্যায় রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে ১৮৪৫ খ্রীঃ রচিত মুন্সী জয়নাথ ঘোষ রচিত রাজোপাখ্যান কে বাংলার প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস বলে দাবী করেছেন (পৃ- ৩)। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান স্বীকৃত যে অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তাকে ঐতিহাসিক বলা যায় তা সত্যিই ঐ গ্রন্থে ছিল কিনা এমন প্রমান পাওয়া যায়না। সংকলকের নিজের ভাষায় এখানে রাজপ্রশস্তির আধিক্য থাকিলেও ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই (পৃ- ৩)। বলাবহুল্য ঐতিহাসিক থাকিলেও তা বিশুদ্ধ ইতিহাস বলে গন্য হতে পারে না। বিশেষ করে রাজপ্রশস্তি অনেক সময়ই প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে বলে বস্তুনিষ্ঠা ব্যহত হয়।

গ্রন্থ আলোচনায় দেখা যায় যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রথম খন্ডে কোচবিহারের ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক অবস্থা, নদ ও নদী, অধিবাসী, জলবায়ু, জীবজন্তু, শিল্প, বাণিজ্য, দ্বিতীয় খন্ডে প্রাচীন রাজধানী গোসানীমারীর রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা, তৃতীয় খন্ডে মহারাজ বিশ্বসিংহের কোচবিহারে রাজ্যস্থাপনা থেকে শুরু করে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়নের রাজত্বকাল সম্পর্কে আলোচনা। কোচবিহার মালবিভাগ, ফৌজদারী বিভাগ, দেওয়ানী বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ, পুলিস, পূর্ত, সৈন্য, ও সংবাদাদি প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মহারানী বৃন্দেশ্বরী দেবী রচিত 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থটি কবিতার ছন্দে কোচবিহারের ইতিহাস বলে দাবী করা হয়েছে। প্রথমে গনেশ ও মহামায়ার বন্দনা করে খর্ব্ব ত্রিপদী ছন্দে কালী বন্দনা করা হয়েছে। এরপর পয়ার ছন্দে গ্রন্থারম্ভ করে কোচবিহারের রাজবংশের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। পরে কখনো পয়ার, ত্রিপদী বা খর্ব্ব ছন্দে সমগ্র গ্রন্থের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রিপুঞ্জয় দাস ও গোবরাছড়া নিবাসী বিদ্যারত্ন উপাধিধারী পন্ডিত রচিত বইটি প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মূল গ্রন্থটির বর্ণনা দিয়েছেন। তবে মূল গ্রন্থের সাথে সংকলকের প্রকাশিত রচনার পার্থক্য হল মূল গ্রন্থে যতি চিহ্ন ছিলনা। অথচ লেখক সেগুলি প্রদান করেছেন।

সবশেষে মেজর ফ্রান্সিস জেনকিন্সের প্রতিবেদনে কোচবিহারের প্রশাসনিক, বিচারবিভাগী অবস্থা, দুর্নীতি, রাজস্বব্যবস্থা, কোষাগারের অবস্থা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

তবে সবশেষে বলা প্রয়োজন এই গ্রন্থগুলি পূনর্মুদ্রিত করে নৃপেন্দ্রনাথ উৎসুক ব্যক্তিদের জ্ঞানস্পৃহা চরিতার্থ করলেও এর দ্বারা তার কোন গবেষনার দিকটি প্রতিফলিত হয়নি বলে তার সম্পর্কে মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

চারু চন্দ্র রায়

চারু চন্দ্র রায়ের প্রকাশিত একটিমাত্র গ্রন্থ নাম হল "চারু রায়ের দারোগাগিরি"। বইটির প্রকাশকাল হল মার্চ ১৯৯০। এটি প্রধানত স্মৃতিচারনমূলক গ্রন্থ হওয়ায় বইটিতে উপন্যাস কেন ছোটগল্পের লক্ষনও সম্পূর্ন উপস্থিত নয়। বরং লেখক যেন খানিকটা গল্প কথকের ভূমিকা গ্রহন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন "চারু বাবুর সমাজ বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থটিকে তৎকালীন সমাজের Sample Survey বলে মানা যায়, এই মন্তব্য অতিরঞ্জন নয়, বরং সঠিকই বলেই মনে হয়"।

পুস্তকটি আরম্ভ হচ্ছে ১৯৩৫ সালে লেখকের পুলিসের দারোগাপদে চাকরীপ্রার্থী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গল্প কথনের মাধ্যমে পাঠক জানতে পারেন কেমন করে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার নামে রাজমাতাকে সামনে রেখে ইংরেজ আই সি এস কিভাবে রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন ও কি করে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর শেষ মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ন ভূপ বাহাদুর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহন করেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়নের সময় থেকে ব্রিটিশ ভারতের ধাঁচে যে শাসন ব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল তার বিবরন, বিশেষ করে পুলিস বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরন পাওয়া যায়। যেমন,[৬] ১৯৩৬ সনে এবিভাগে ছিলেন এস পি একজন, ইন্সপেক্টর দুজন, সাব ইন্সপেক্টর উনিশজন, এ এস আই চব্বিশজন, হেড কনষ্টেবল বারজন, আর কনষ্টেবল দুশো একুশজন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন চাকরী কিছু ছিল, কিন্তু সীমিত সংখ্যায়।[৭] এখানে তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনায় তার গল্প কথকের ভঙ্গিটি লক্ষ্যনীয়। তবে বেকারী পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্রিটিশ ভারতে Employment Exchange প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই কাউন্সিল অর্থাৎ দরবারের দপ্তরে একটি খাতা খোলা হয় (পৃ- ১৩, অনুচ্ছেদ ২)। এই সংবাদ বেশ চমকপ্রদই লাগে। রাজসাহী জেলার সার্দাতে পুলিস ট্রেনিং কেন্দ্রে লেখকের সহ শিক্ষানবিশদের কয়েকজন তাদের স্নাতকোত্তর ও স্নাতক ডিগ্রী গোপন করে চাকরীতে প্রবেশ প্রমান করে যে বিগত দিন মাত্রেই সুখের দিন নয়। তাছাড়া লেখকের বন্ধু অশ্বিনী সরকার বা নেদুর উপরওয়ালাদের কাছে সুবিচার লাভে ব্যর্থ হয়ে খোদ মহারাজার সাথে দেখা করে চাকরীতে স্থায়িত্বলাভ প্রমান করে অবিচারের কোন স্থান, কাল, পাত্র ভেদ নেই।

বহুদিন দারোগাগিরি করে লেখকের উপলব্ধি যে লোক চরিত্র আর সামাজিক পরিবেশ আর প্রথার খুঁটিনাটি জ্ঞান দারোগাগিরিতে যত দরকার তত আর কোন বৃত্তিতেই বোধ হয় দরকার হয়না (পৃ- ২৫, অনুচ্ছেদ ৩)। পুলিস ও জনগনের সম্পর্ক আজ যতদুর অতীতেও তাই ছিল। তার প্রমান হিসাবে এই কাহিনীতে দেখতে পাই হুমায়ুন কবিরের সভায় থানার কর্মিদের কেন নিমন্ত্রন করা হয়নি তার উত্তরে নিমন্ত্রনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে "বাঃ কমিটি তো বললো সব ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রন করতে, লিস্ট ও করে দিল। তা দেখুন লিস্টে কোন ভদ্রলোকই বাদ নেই, এ পাড়ার সব ভদ্রলোককে নিমন্ত্রন করা হয়েছে" (পৃ- ২৪, অনুচ্ছেদ ২)। বস্তুত পুলিস ও ভদ্রলোকের যে পার্থক্য লেখক আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছেন তা আজও যেন সমান ভাবে সত্য।

কিন্তু পুলিসে চাকরী করেও লেখক যে তার বিবেককে বিসর্জন দেননি তার প্রমান দাগী চোর সরল সাইকেল চুরির অপরাধে ধরা পড়ার পর যখন জানতে চায় "বাবু তোমরাই কন, হামারগুলার বাঁচিবার আর কোন আস্তা (রাস্তা) আছে ? এর উত্তরে ব্যাঙ্গের ছলে যখন লেখক বলেন "দেখুন দিকি ব্যাটার কি আস্পর্ধা দারোগার কৈফিয়ত চায় তুই চুরি করলে তোকে ধরা দারোগার ডিউটি, জেল থেকে বেরিয়ে কি খাবি তা দেখা দারোগার ডিউটির মধ্যে পড়েনা" (পৃ- ৭৭, অনুচ্ছেদ ২,৩), তখন তা যেন নিজের উদ্দেশ্যই ধিক্কার বলে মনে হয়। তবে গ্রন্থের ১১৮ ও ১৫৯ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অতিপ্রকৃত ঘটনাদুটি পাঠকমন যে সহজে মেনে নিতে চাইবেনা একথা সত্য। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় ঘটনাগুলি সুখশ্রাব্য। তবে লেখকের রচনার অন্যতম ত্রুটি হল এক ঘটনার বর্ণনা করতে করতে লেখক অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। যেমন পুন্ডিবাড়ী শকুনীবালা গ্রামের পথে যাবার বর্ণনা করতে করতে তিনি গোকূলের কুঠি গ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লোকের আতিথেয়তার বর্ণনা করেন 'এ অঞ্চলের প্রায় সব গিরিই (গৃহস্থ) এ কথাটা মানেন দিনে একজন অতিথিকে না খাইয়ে তারা অন্নগ্রহন করেননা' (পৃ- ৫৩)। তবে আলোচ্য কাহিনীর ভূতনাথ চরিত্র লেখকের বর্ণনাগুনে সজীব ও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। আর সংলাপপত্র গুলিও যেন চরিত্রানুগ। বস্তুত লেখক সজ্ঞানে সাহিত্য চর্চা না করলেও দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এটি একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উৎস নির্দেশ (নাটক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য)

১। মধুপর্ণী - কোচবিহার জেলা সংখ্যা ।

২। কোচবিহারের নাট্যচর্চা-একটি অনুসন্ধান — দীপায়ন ভট্টাচার্য ।

৩। কোচবিহার জেলার বার্ষিক গনগ্রন্থাগার সংখ্যা - পাতে পাতে পথ চলা - তং দিনহাটা দেওয়ানহাট - বার্ষিক সময়ী ১৯৯৯
কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগার ও তার ... বার্ষিক গ্রন্থাগার সংখ্যা - ১৯৯৯

৪। তিনশ বছরের যাত্রাশিল্পের ইতিহাস — গৌরাঙ্গ প্রসাদ হাজরা ।

৫। মধুপর্ণী - কোচবিহার জেলা সংখ্যা ।